ভারতীয় দর্শন

(Indian Philosophy)

(তৃতীয় খণ্ড)

[বেদ ও উপনিষদ]

শ্রীপ্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত, এম. এ. (দর্শন ও বাংলা),
দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক, কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ,
হেতমপুর, (বীরভূম) ।

বি.পি

ব্যানার্জী পাবলিশার্স
৫।১-এ কলেজ রো
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশক :
শ্রীসূর্যকুমার ব্যানার্জী
ব্যানার্জী পাবলিশার্স
৫/১-এ কলেজ রো
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট, ১৯৫৫

মুদ্রাকর :
শ্রীধনঞ্জয় দে
রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

ভূমিকা

কলিকাতা ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বাংলাতে দর্শন (অনার্স) পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমার ভারতীয় দর্শন (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) অনার্স ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী করে ইতিপূর্বে পরিমার্জন করা হয়েছে। বেদ ও উপনিষদের দর্শন অনার্স ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্য-সূচীর অন্তর্ভুক্ত। এই অংশটি ভারতীয় দর্শন—তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশ করা হল। এই অংশের আলোচনাও সরল, সহজ ও সমালোচনামূলক করা হয়েছে। স্নাতক ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে লিখিত হলেও, সাধারণ পাঠকও এই অংশ পাঠে উপকৃত হবেন। বিষয়বস্তুর আলোচনার জন্য যে-সব পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে তা প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে উল্লিখিত হয়েছে। এ ছাড়া প্রয়োজনীয় প্রশ্নগুলিও প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে।

যাদের জন্য গ্রন্থখানি রচনা করা হল তারা উপকৃত হলে আমার শ্রম সার্থক হল মনে করব। হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক শ্রীগিরিধারী শাস্ত্রী, সপ্ততীর্থ মহাশয় কোন কোন দুরূহ বিষয়ের আলোচনায় আমায় সাহায্য করেছেন। এজন্য তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ব্যানার্জী পাবলিশার্সের স্বত্বাধিকারী শ্রীসূর্যকুমার ব্যানার্জী এই পুস্তক প্রকাশ করে এবং রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, কলিকাতা—৯, পুস্তকখানি মুদ্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করে আমায় কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। ইতি—

হেতমপুর
১:ই আগষ্ট, ১৯৭৫

প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

বেদের দর্শন

দ্বিতীয় অধ্যায়

উপনিষদের দর্শন

বেদ ও উপনিষদের দর্শন

THE PHILOSOPHY OF THE VEDAS AND THE UPANISHADS

প্রথম অধ্যায়

বেদের দর্শন

(The Philosophy of the Vedas)

১। বেদের প্রাচীনতা (The antiquity of the Vedas):

বেদকে কেন্দ্র করে ভারতীয় দর্শনের শুরু

বেদই আর্য্যদের প্রাচীনতম সাহিত্য কীর্তির পরিচয় বহন করে। বেদের মাধ্যমেই বৈদিক আর্য্য সংস্কৃতির পরিচয় লাভ করা যায়। 'বেদকে অবলম্বন করেই আর্য্যজাতির বর্ণাশ্রমধর্ম ও সমাজ চির প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।' বেদকে কেন্দ্র করেই যে ভারতীয় দর্শনের শুরু, অতি সহজেই তা নিরূপণ করা যেতে পারে। বেদ হিন্দুদের সিদ্ধশাস্ত্র। হিন্দুধর্মের বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে বেদের স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত 'সামবেদে'র পরিশিষ্টাংশে বলা হয়েছে, "বৈদিক সংস্কৃতি ভারতীয় সভ্যতার মূল ভিত্তি। বেদ ধর্মতত্ত্বের সীমাশূন্য সরোবর। অধুনা যে সকল ধর্ম ও দর্শন বিশাল ভারতে প্রচলিত, উহার মূল বীজ বেদেই নিহিত। ভারতীয় সর্বধর্ম সম্প্রদায় বেদবাক্য দ্বারা স্ব স্ব সিদ্ধান্ত প্রমাণিত করিয়াছেন। ষড়দর্শন, শংকরের বেদান্ত, রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈত, নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈত, মধ্বাচর্য্যের দ্বৈত, বল্লভের শুদ্ধাদ্বৈত, চৈতন্যের অচিন্ত্য ভেদাভেদ, আর্য্য সমাজ, ব্রাহ্ম সমাজ প্রভৃতি ভারতীয় সর্ব ধর্মের মূল উৎস বেদ। বৈদিক সংস্কৃত প্রাচীনতম আর্য্যভাষা ও বেদ মানব জাতির আদি গ্রন্থ।"[1]

বেদ শব্দের অর্থ

সংস্কৃত 'বিদ্' ধাতু থেকে বেদ পদটি নিষ্পন্ন। বিদ্+ঘঞ্ = বেদ। বিদ্ মানে জানা, তাই বেদ শব্দের ধাতুগত অর্থ জ্ঞান বা বিদ্যা। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক—এই সব জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা অতীন্দ্রিয়জ্ঞান লাভ করতে পারি না। অতীন্দ্রিয় পরমজ্ঞান আমরা বেদ থেকে লাভ করতে পারি। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—

'প্রত্যক্ষেণানুমিত্যা বা যস্তু পায়ো ন বিদ্যতে।
এনং বিদন্তি বেদেন তস্মাদ্ বেদস্য বেদতা।'

---

1. সামবেদ: স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত, পৃঃ ৫৯

অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বা অনুমানের সাহায্যে যে জ্ঞান লাভ করার কোন উপায় নেই, সেই অতীন্দ্রিয় জ্ঞান বেদ থেকে লাভ করার জন্য এই ধর্মগ্রন্থকে বেদ নামে অভিহিত করা হয়। যার দ্বারা ধর্মাধর্ম সব বিষয়ই জানা যায় তাই বেদ। বেদের সাহায্যেই অলৌকিক পরমার্থ তত্ত্ব জানা যায়। 'বেদ ধর্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদক অপৌরুষেয় শ্রুতিবচন।' বৈদিক আচার্য্যগণের অভিমতানুসারে ধর্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব একমাত্র বেদ থেকেই জানা যায়। 'ধর্মব্রহ্মণী বেদৈক বেদ্যে।' মনু বেদকে অখিল ধর্মের মূল বলে অভিহিত করেছেন।[1] 'বেদঃ অখিলধর্মমূলম্।' ধর্মশাস্ত্রকার গৌতমও একই অর্থে বলেছেন, 'বেদো ধর্মমূলম্'। বেদের সাহায্যে সব রকম লৌকিক জ্ঞান সহ অলৌকিক ব্রহ্মতত্ত্ব পর্য্যন্ত জানা যায়। ধর্ম ও তার সঙ্গে যুক্ত কর্ম, কর্মফল, যজ্ঞ, যজ্ঞফল স্বর্গ, পরলোকতত্ত্ব, অদৃষ্ট প্রভৃতি ধর্মসম্বন্ধীয় যাবতীয় জ্ঞান, ব্রহ্ম, মোক্ষ প্রভৃতি সব বিষয়ের জ্ঞান বেদপাঠে জানা যায়। বেদে জ্ঞান, কর্ম ও আত্মতত্ত্বের উপাসনা বিশেষভাবে ব্যক্ত হয়েছে। বেদ পাঠে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায়। বেদ নিত্য, সত্য এবং স্বতঃপ্রমাণ।

শ্রুতি, ত্রয়ীবিদ্যা বা ত্রয়ী, আগম, ছন্দস্ প্রভৃতি বেদের প্রচলিত প্রতিশব্দ। অনাদিকাল থেকে বেদ গুরু, শিষ্য, প্রশিষ্য পরম্পরা শ্রুতিতে রক্ষিত হত বলে তার আর এক নাম শ্রুতি। দীর্ঘকাল পরে তা লিপিবদ্ধ হয়। শ্রীশ্রীশংকরাচার্য্য, ঋষি বাদরায়ণ প্রভৃতি শ্রুতি সংজ্ঞা ব্যবহার করেছেন। পানিনি তার ব্যাকরণ সূত্রে 'ছন্দস্' বা 'ছন্দঃ' প্রতিশব্দটি ব্যবহার করেছেন। বেদকে 'ত্রয়ী বিদ্যা' বা কেবল 'ত্রয়ী'-ও বলা হয়। ঋগ্‌বেদ, সামবেদ ও যজুর্বেদ—এই তিন বেদকে একত্রে ত্রয়ী বলা হয়। বেদের মধ্যে অথর্ববেদের স্থান আছে কিনা—এটি বিদ্বৎ সমাজে একটি বিতর্কমূলক প্রশ্ন। এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হয়েছে।

স্বামী প্রজ্ঞানন্দ তাঁর রচিত 'ভারতের সাধনা' গ্রন্থে বলেন, "বেদ বলিতে স্বরূপতঃ ব্রহ্মকেই বুঝিতে হইবে, অন্য উপায় নাই। ব্রহ্ম, ব্রহ্মজ্ঞান বা পরম জ্ঞানই বেদ শব্দের মুখ্য অর্থ। এই অর্থে বেদ অপৌরুষেয়, দেশকাল দ্বারা

1 মনু সংহিতা ২।৬

অনবচ্ছিন্ন। বস্তুতঃই ব্রহ্ম নিরূপণ ও ব্রহ্ম একার্থ সংজ্ঞক। ব্রহ্মই বেদরূপ পরম জ্ঞান, আবার বেদের শব্দ শরীর বেদ শব্দের গৌণ অর্থ। ব্রহ্ম স্বয়ংই মুখ্য বেদ।"

বেদের প্রাচীনতম অংশগুলির আবির্ভাব সর্বপ্রথম কখন ঘটেছে বলা সত্যই খুব কঠিন। এ সম্পর্কে অনেক অনুমান করা হয়েছে। কিন্তু কোন অনুমানই নিঃসন্দিগ্ধভাবে সত্য প্রমাণিত হয়নি। মার্টিন ও কোলব্রুক-এর মতে খ্রীষ্টপূর্ব বিশ শতক থেকে চোদ্দ শতকের মধ্যে বেদের আবির্ভাব ঘটেছে। ম্যাক্সমূলার (*Max Muller*)-এর মতে বেদের আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টের জন্মের ১২০০ বৎসর পূর্বে। হগ (*Haug*)-এর মতে ২৪০০ বৎসর; এবং বাল গঙ্গাধর তিলকের মতে খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০০ বৎসর পূর্বে বেদের প্রথম আবির্ভাব। উইণ্টারনিজ (*Winternitz*) বলেন, "দুর্ভাগ্য বশতঃ ঋগ্বেদের জন্মকাল সম্বন্ধে খ্যাতনামা পণ্ডিতদের মধ্যে ভীষণ মতভেদ বর্তমান। মতভেদ অনুসারে এই কালের পার্থক্য শত শত বছরের নয়, হাজার হাজার বছরের। বিশেষজ্ঞদের মধ্যে, এত মতভেদ থাকলে কোন তারিখ নির্ধারণ অসম্ভব। সম্ভবতঃ ইন্দোআর্য্য সভ্যতার শুরুতে বেদ রচিত হয়েছে।" প্রাচীনকালে হিন্দুরা কদাচিৎ তাদের সাহিত্য, ধর্ম বা রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় কৃতিত্বের বিবরণ লিপিবদ্ধ করত। কাজেই সুদীর্ঘকাল ধরে মুখে মুখেই এগুলির প্রচার ঘটেছিল।

বেদের আবির্ভাবকাল

বেদকে হিন্দুরা অপৌরুষেয় মনে করে। অপৌরুষেয় অর্থে যা মানুষের রচনা নয়। শতপথ ব্রাহ্মণে[1] উক্ত আছে যে জগৎ সৃষ্টির আদিকর্তা হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা যজ্ঞাদি কর্ম সম্পাদন করে সৃষ্টি রক্ষার জন্য অগ্নি থেকে ঋক্, বায়ু থেকে যজুঃ এবং সূর্য্য থেকে সামবেদ প্রকাশ করেছিলেন। এই কারণেই ঋগ্বেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অগ্নি, যজুর্বেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বায়ু ও সামবেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হলেন সূর্য্য। ঋষিদের কাছ থেকেই বেদ ও বৈদিক ধর্ম ক্রমশঃ সমাজে সমাদর লাভ করেছে। যে ঋষির কাছ থেকে যে বেদের মন্ত্রগুলি সংগৃহীত হয়েছে, সেই বেদের সেই মন্ত্রগুলি সেই ঋষির নামেই শাখারূপে বিভক্ত হয়েছে।

1. ১১।৪।২।৩

বেদ কোন পুরুষের চিন্তাপ্রসূত নয়। বেদ অনাদি ও অনন্ত; কালাদির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নয়। পূর্বেই বলা হয়েছে বেদের অপর নাম শ্রুতি। কারণ পরমেশ্বরের বাণী সর্ব প্রথম ঋষিগণ অলৌকিক যোগশক্তির সাহায্যে শুনতে পান। বেদকে শ্রুতি বলার অন্য কারণ বেদের সত্যগুলি গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ না হয়ে গুরুশিষ্য পরম্পর শ্রুত হয়ে মানব সমাজে প্রচলিত হয়। স্মৃতি শ্রুতির অনুগত। শ্রুতি ও স্মৃতির বিরোধে শ্রুতিই অনুসরণীয়। বৈদিক যুগে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে বেদের সংহিতা ভাগ কণ্ঠস্থ করার রীতি ছিল। বেদ অপৌরুষেয়। বৈদিক ঋষিদের অন্তর্দৃষ্টিতে যে পরম সত্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল সেগুলিই বেদে প্রকাশিত হয়। বেদের আবির্ভাবের পর কিছু সময় অতিক্রান্ত হলে, লোকেরা বেদকে অত্যন্ত প্রাচীন বলে গণ্য করতে লাগল; বস্তুতঃ এতই প্রাচীন গণ্য করতে লাগল যে কোন বিশেষ কালে বুঝি বেদের আবির্ভাব ঘটেনি, যদিও বিশ্বাস করা হত যে সুদূর অতীত কালে, এক অজ্ঞাত সময়ে বেদের সত্য প্রত্যাদিষ্ট হয়েছিল।

বেদ অপৌরুষেয়

২। বেদের শ্রেণীবিভাগ (The classification of the Vedas):

বেদ চারভাগে বিভক্ত—ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ এবং অথর্ববেদ। এই চার বেদের মধ্যে ঋগ্বেদই প্রাচীন ও প্রধান। ব্যাসদেব চতুর্বেদের বিভাগকর্তা বলে তাঁর নাম বেদব্যাস। তিনিই হলেন ঋষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন। বেদের চারটি অংশ—মন্ত্র সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ। আরণ্যক, ব্রাহ্মণের অন্তিম অংশ এবং আরণ্যকের অন্তিম অংশ উপনিষদ। ব্রাহ্মণের যে অংশ অরণ্যে বসবাসকালে সুগভীর তত্ত্বানুসন্ধান সহকারে পাঠ্য তার নাম আরণ্যক। আবার মতভেদে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ভাগের সারাংশ অরণ্যে বসবাসকারী ঋষিদের দ্বারা আলোচিত হওয়াতে আরণ্যক নাম হয়েছে। বেদের প্রাচীন বিভাগ হল মন্ত্র আর ব্রাহ্মণ। মন্ত্রই বেদের মূলভাগ। ব্রাহ্মণ তার উপব্যাখ্যান। আরণ্যক ও উপনিষদ ব্রাহ্মণের অন্তর্গত। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ অংশের দুটি বিভাগ। 'মন্ত্রে তত্ত্ব ও সাধনার যে ব্যঞ্জনা আছে

বেদের চারিটি বিভাগ

বেদের চারিটি অংশ—মন্ত্রসংহিতা, ব্রাহ্মণ আরণ্যক ও উপনিষদ

তাকে পরিস্ফুট করা হয়েছে ব্রাহ্মণে।' ব্রাহ্মণভাগ এক হিসেবে মন্ত্রভাগের ব্যাখ্যা-বিশেষ। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের দ্বারা অধীত বেদমন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা হয়েছিল বলেই ব্রাহ্মণ নাম হয়েছে। মন্ত্রের নানবিধ আলোচনা, বিবিধ যাগযজ্ঞের প্রক্রিয়ার বিবরণ ও আলোচনা, মন্ত্রের যাগে বিনিয়োগ এবং প্রসঙ্গক্রমে নানাবিষয়ের উপাখ্যান ব্রাহ্মণে সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

সংহিতায় রয়েছে মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণে রয়েছে তার অর্থ ও ব্যবহার। বেদের মন্ত্রের সঙ্গে ক্রিয়াকাণ্ডের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। এই ক্রিয়াকাণ্ডের দিকটিকে সুস্পষ্ট ও সুশৃংখল করে তোলাই ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্য। বেদের মন্ত্রাংশের নামই সংহিতা। মন্ত্রই বেদের মূল কাঠামো। মন্ত্র বা সংহিতা বলতে 'বেদের সূক্ত, স্তব, স্তুতি, আশীর্বচন, প্রার্থনা এবং যজ্ঞ সংশ্লিষ্ট নিষিদ্দ প্রভৃতি বোঝায়।' ব্রাহ্মণের কাজ হল মন্ত্রের প্রয়োগ এবং তাৎপর্য্য বিচার করা, ব্যাখ্যা করা। সংহিতা হিসেবে বেদের মন্ত্রগুলিকে চারভাগে ভাগ করা হয়েছে। তাই চতুর্বেদের কথা বলা হয়। কিন্তু বেদকে আবার 'ত্রয়ীও' বলা হয়। এই বিভাগ অনুযায়ী বেদকে ঋক্, যজুঃ, ও সাম—এই তিনভাগে ভাগ করা হয়। এই বিভাগ কারও কারও মনে এরূপ ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করেছে যে অথর্ব বেদ যেহেতু বেদত্রয়ের বহির্ভূত, তাকে বেদ বলা চলে না। আসলে অথর্ববেদ যজ্ঞে ব্যবহৃত হয় না বলেই তাকে ত্রয়ীর মধ্য গণ্য করা হয় না। এর দ্বারা অথর্ববেদের অবেদত্ব প্রমাণিত হয় না। অথর্ববেদ ঋগ্বেদের পরিপূরক। বেদেই উল্লিখিত আছে যে অথর্ববেদ বেদেরই অন্তর্ভুক্ত।

অথর্ববেদ ঋগ্বেদের পরিপূরক

চতুর্বেদের ভাষ্যকার সায়নাচার্য্য ঋগ্বেদ ভাষ্যে আপস্তম্বকৃত যজ্ঞপরিভাষার এই বাক্যটি উদ্ধৃত করেছেন—'মন্ত্র-ব্রাহ্মণয়োর্বেদ নামধেয়ং'। এর অর্থ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের নাম বেদ। মীমাংসা সূত্রেও আছে বেদের দুই অংশ—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এবং যে অংশ মন্ত্র নয় সে অংশ ব্রাহ্মণ। মন্ত্রাংশের অপর নাম সংহিতা কারণ এই অংশে মন্ত্রগুলি সংহিত বা সংগৃহীত।

বেদ-মন্ত্র তিন প্রকার—ঋক্, সাম ও যজুঃ। যজ্ঞে হোতা, উদ্গাতা ও অধ্বর্য্যু—এই তিন ধরনের পুরোহিত বেদমন্ত্র উচ্চারণ করতেন। মন্ত্র নিত্য

পাদাক্ষরযুক্ত ও ছন্দোবদ্ধ হলে হয় ঋক্। যজ্ঞের সময় হোতা এবং তাঁর সহকারীবর্গ ঋক্‌মন্ত্রে দেবতার আহ্বান করতেন। মন্ত্র গীত হলে তা হয় সাম। উদ্গাতা ও তাঁর সহকারীবৃন্দ সাম গান করেন। এ ছাড়া সব মন্ত্রই হল যজুঃ। অধ্বর্যু ও তার সহকারীবৃন্দ যজু মন্ত্রে আহুতি প্রদান করতেন। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে ঋক্ পদ্য, যজুঃ গদ্য আর সাম গান। ঋক্কেই স্বর দিয়ে সাম রচিত হয়।

বেদ-মন্ত্র তিন প্রকার

বেদ অপৌরুষেয়। বেদ মানব রচিত নয়। বেদ 'ঈশ্বর-নিঃশ্বসিত' হওয়াতে 'অনাদি ও অনন্ত'। চতুর্বেদের ভাষ্যকার সায়নাচার্য্য বলেন, "নহি বেদস্য কর্তারো দ্রষ্টারঃ সর্ব এব হি।" ঋষিরা বেদের কর্তা নন্, তাঁরা মন্ত্রের দ্রষ্টা মাত্র।

মন্ত্র বলতে কি বোঝায়? নিরুক্তের রচয়িতা যাস্ক মতে 'মন্ত্রা মননাৎ'।[1] মনন থেকেই মন্ত্র শব্দটির উৎপত্তি। যার দ্বারা মনন করা হয় তাই মন্ত্র। যা থেকে কর্ম ও তার অনুষ্ঠান উপযোগী উপকরণ দ্রব্যাদি এবং অনুষ্ঠানের ফলদাত্রী দেবতার মনন (জ্ঞান) জন্মায় তাকে মন্ত্র বলে। মন্ত্র থেকেই মননকারীগণ অধ্যাত্ম ও আধিদৈবিক বিষয় চিন্তা করে থাকেন। ব্রাহ্মণ বলতে কি বোঝায়? এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। ব্রাহ্মণ শব্দের বিভিন্ন বুৎপত্তি ও ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মণ্ শব্দ থেকে ব্রাহ্মণ শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। কারও কারও মতে বেদের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত বলেই ব্রাহ্মণ নাম হয়েছে। আবার কেউ কেউ ব্রাহ্মণ বলতে ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে বুঝেছেন। তাঁদের মতে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের যজ্ঞ ও যজ্ঞের বিবিধ ক্রিয়া কাণ্ড সম্বন্ধে উক্তিগুলি যে শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হয়েছে তার নাম ব্রাহ্মণ। এই ব্যাখ্যা কারও কারও মতে যুক্তিযুক্ত। যজুর্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে 'ব্রহ্ম বৈ ব্রাহ্মণঃ' অর্থাৎ ব্রহ্মণ্‌ই ব্রাহ্মণ। এক মতে 'ব্রাহ্মণ বা স্তোত্রাংশ সম্বন্ধে যা উক্ত হয়েছে, তাই ব্রাহ্মণ।' আপস্তম্ব বলেন 'কর্মচোদনা ব্রাহ্মণানি'। এর অর্থ কর্মচোদনা বা যজ্ঞবিধিই ব্রাহ্মণ। কর্মচোদনা কথাটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আপস্তম্ব বেদের ব্রাহ্মণ ভাগের বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে মুখ্যতঃ

মন্ত্রের পরিচয়

1. নিরুক্ত (৭—১২—১)

ছটি বিষয় ব্রাহ্মণে আলোচিত হয়েছে। (১) বিধি—বিশেষ বিশেষ কর্ম অনুষ্ঠানের জন্য যে নির্দেশ বা চোদনা বাক্য শ্রুত হয় তাই বিধি। বিধি আবার চার প্রকার, উৎপত্তি বিধি, অধিকার বিধি, বিনিয়োগ বিধি এবং প্রয়োগ বিধি। এই চার প্রকার বিধিবাক্য অনুসারে বেদে উল্লিখিত সব রকমের ধর্মকর্ম অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। (২) অর্থবাদ—বেদ মন্ত্রের অর্থ প্রসঙ্গে এবং বিবিধ ক্রিয়াকাণ্ড সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ গ্রন্থে প্রদত্ত ব্যাখ্যা, (৩) নিন্দা—বিরোধী মতের সমালোচনা, খণ্ডন ও পরিহারকে নিন্দা বলা হয়। 'ব্রাহ্মণ গ্রন্থের বিতর্কবহুল পরমত খণ্ডন, স্বমতস্থাপনাত্মক অংশগুলি' নিন্দা শব্দের দ্বারা বুঝে নিতে হবে। (৪) প্রশংসা —এর অর্থ স্তুতি এবং যার স্তুতি করা হয় সেই ক্রিয়ার অনুমোদন করা হয়। (৫) পুরাকল্প—অতি প্রাচীনকালে সম্পাদিত যজ্ঞ পুরাকল্প নামে অভিহিত। দেবতাদের অনুষ্ঠিত যাগ-হোমাদি শ্রৌত ক্রিয়া-কাণ্ডের যে সব কাহিনী বা পুরাবৃত্ত ব্রাহ্মণ গ্রন্থে উল্লিখিত সেই সব বৃত্তান্তও পুরাকল্পের অন্তর্ভুক্ত। (৬) পরকৃতি—পরের কৃতিই হল পরকৃতি। এক্ষেত্রে যজ্ঞে পুরোহিতদের কীর্তি, নৃপতিদের যজ্ঞ, দান দক্ষিণা প্রভৃতি কীর্তি পরকৃতি শব্দে বুঝতে হবে।

কেউ কেউ উপরিউক্ত ছটি লক্ষণকে মাত্র দুটি লক্ষণে—বিধি ও অর্থবাদে, রূপান্তরিত করার ইচ্ছুক। তাঁরা মনে করেন বিধি ছাড়া আর পাঁচটি লক্ষণ অর্থবাদেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ। কেউ কেউ মনে করেন যে ব্রাহ্মণে শুধুমাত্র যাগ-যজ্ঞের কথাই লিপিবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু অনেকে তা স্বীকার করেন না। যেমন ম্যাক্সমুলার (*Maxmuller*) ব্রাহ্মণ গ্রন্থেও উচ্চাঙ্গের আধ্যাত্মিক চিন্তা-ধারার সন্ধান পেয়েছেন। কেউ কেউ ব্রাহ্মণের বেদত্ব অস্বীকার করেছেন। কিন্তু অনেকে এই অস্বীকৃতিকে সমীচীন ও যুক্তিযুক্ত মনে করেন না। মীমাংসা সূত্রে জৈমিনি ব্রাহ্মণের বেদত্ব স্পষ্টতঃই স্বীকার করেছেন। 'শেষে ব্রাহ্মণশব্দঃ' অর্থাৎ বেদের মন্ত্র ভাগ ছাড়া অবশিষ্ট অংশ হল ব্রাহ্মণ। এই সূত্রে ব্রাহ্মণের বেদত্ব স্বীকার করা হয়েছে। তাছাড়া বেদের কর্মকাণ্ড নিয়েই পূর্ব মীমাংসা দর্শন রচিত।

সায়নাচার্য্যের মতে বিধি দ্বিবিধ—অপ্রবৃত্ত প্রবর্তক ও অজ্ঞাত জ্ঞাপক। কর্মকাণ্ডোক্ত বিধিগুলি অপ্রবৃত্তকে যজ্ঞকর্মে প্রবৃত্ত করে এবং জ্ঞান-কাণ্ডোক্ত

বিধিগুলি অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞাপক হয়। মীমাংসকেরা ব্রাহ্মণের কোন স্বতন্ত্র লক্ষণ দেননি। তাঁরা বলেন, যে বেদবাক্য ইষ্টার্থের প্রচোদক তাই মন্ত্র। তাছাড়া সবই ব্রাহ্মণ। যাগযজ্ঞাদি কর্মকাণ্ড থেকে যখন বৈদিক যুগের আর্যদের চিত্ত জ্ঞানযোগের দিকে আকৃষ্ট হল তখনই আরণ্যকের উৎপত্তি। "আরণ্যকে যে জ্ঞানযোগ ও অধ্যাত্মবিদ্যার সূত্রপাত, উপনিষদে তার পরাকাষ্ঠা।" আত্মা অনাত্মার প্রভেদ, সৃষ্টিতত্ত্ব, পরমাত্মা জীবাত্মার তত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব ও মোক্ষতত্ত্ব প্রভৃতি অধ্যাত্মতত্ত্ব উপনিষদে আলোচিত হয়েছে। আরণ্যক ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের মধ্যবর্তী স্থান অধিকার করে আছে।

অরণ্যে উক্তমিতি ইতি আরণ্যকম্, অর্থাৎ যা অরণ্যে উক্ত হয় তাই আরণ্যক। দ্রব্যযজ্ঞ আরণ্যকে জ্ঞানযজ্ঞের রূপ গ্রহণ করেছে। অরণ্যেই আচার্য্যগণ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসু শিষ্যকে অধ্যাত্মবিদ্যা দান করতেন। এ কারণে এই বিদ্যা যে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ তাকে আরণ্যক বলা হয়। আবার কেউ কেউ অরণ্য শব্দটিকে ব্রহ্ম অর্থে ব্যবহার করেছেন। অরণ্য যেমন গভীর ও নিবিড়, ব্রহ্ম-তত্ত্বও তাই। যে শাস্ত্রে ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞান লিপিবদ্ধ আছে তাকেই তাঁরা আরণ্যক নামে অভিহিত করেছেন।

মন্ত্রের তাৎপর্য্য জ্ঞান ও কর্ম উভয়ের মাধ্যমেই সম্ভব। কর্ম এবং জ্ঞান, উভয়েরই বিচারের প্রয়োজন আছে। তাই ব্রাহ্মণ দুভাগে ভাগ হয়ে গেল—শুদ্ধ ব্রাহ্মণ যা কর্মকাণ্ডের ধারক আর উপনিষদ যা জ্ঞানকাণ্ডের ধারক। আরণ্যক এই দুই-এর মাঝামাঝি। উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে বেদের দুটি প্রাচীন বিভাগ—কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। ব্রাহ্মণ গ্রন্থে প্রধানতঃ যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকাণ্ডের বিবরণ পাওয়া যায় তজ্জন্য তাকে কর্মকাণ্ড বলা হয়। আরণ্যকে বিশেষতঃ উপনিষদে জ্ঞানযোগের আলোচনা মুখ্য বিষয়। তাই তাকে জ্ঞানকাণ্ড আখ্যা দেওয়া হয়। কর্মকাণ্ডপ্রধান ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলি থেকে এবং জ্ঞানকাণ্ডপ্রধান উপনিষদ থেকে দুটি প্রধান ভারতীয় দর্শনের উদ্ভব। বেদের ব্রাহ্মণ ভাগকে অবলম্বন করে পূর্ব মীমাংসা এবং উপনিষদকে অবলম্বন করে উত্তর মীমংসা রচিত হয়েছে।

মন্ত্র-সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক আর উপনিষদ—এই নিয়ে বেদ বা শ্রুতি। শ্রুতিকে আয়ত্ত করার সাধন হল বেদাঙ্গ। বেদের মর্ম যথার্থভাবে উপলব্ধি করার জন্য বেদের কতকগুলি অবয়ব গ্রন্থ অধ্যয়নের প্রয়োজন আছে। এই অবয়ব গ্রন্থগুলিকে বলা হয় বেদাঙ্গ। বেদাঙ্গ ছটি—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ। শিক্ষা ও ব্যাকরণের রচয়িতা পানিনি। ছন্দের রচয়িতা পিঙ্গলাচার্য্য। নিরুক্তের রচয়িতা যাস্ক, জ্যোতিষ্কের গর্গ এবং কল্পের রচয়িতা বিভিন্ন ঋষিগণ। শিক্ষা-সূত্রে বর্ণের বিশুদ্ধ উচ্চারণ সম্পর্কে নিয়ম নিবদ্ধ হয়েছে। ব্যাকরণ সূত্র হল শব্দ বুৎপাদক শাস্ত্র। এতে পদসাধনাদির নিয়ম আছে। নিরুক্তে বৈদিক শব্দের যোগার্থ নিরূপিত হয়েছে। ছন্দতে বৈদিক পদ্য বন্ধের নিয়মাবলী বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বিশ্লেষিত হয়েছে। জ্যোতিষে গ্রহ নক্ষত্রাদির স্থান ও গতি আলোচিত হয়েছে। কল্পসূত্র-শ্রৌতসূত্র, ধর্মসূত্র ও গৃহ্যসূত্র, এই তিনের সমষ্টি। শ্রৌত-সূত্রে শ্রৌত অর্থাৎ বৈদিক যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। ধর্মসূত্রে প্রত্যেক ব্যক্তির, সমাজের ও দেশের প্রতি কর্তব্যকর্ম নিরূপিত হয়েছে। গৃহ্যসূত্রে—প্রত্যেক গৃহীর 'পিতা-পুত্র ভ্রাতা স্বামীরূপে স্বপরিবারভুক্ত অপর সকলের প্রতি কর্তব্যকর্ম বিশদভাবে বিধিবদ্ধ হয়েছে'। বেদাঙ্গগুলি সূত্রের আকারে রচিত হয়েছিল। 'মন্ত্র আর ব্রাহ্মণ নিয়ে যেমন বেদ, তেমনি বেদ আর বেদাঙ্গ নিয়ে বৈদিক সাহিত্য।'

ছটি বেদাঙ্গের পরিচয়

বেদের আবার শাখাভেদ ছিল। শৌনকের 'চরণ্যব্যূহসূত্রম' গ্রন্থ অনুসারে ঋগ্বেদের পাঁচটি শাখা, যজুর্বেদের ছিয়াশী শাখা, সামবেদের হাজার শাখা এবং অথর্ব বেদের নয়টি শাখা। ঋগ্বেদের পাঁচটি শাখা হল—শাকল, বাস্কল, আশ্বলায়ন, শাংখ্যায়ন ও মাণ্ডুকায়ণ। ঋগ্বেদ সংহিতার পূর্বোক্ত পাঁচটি শাখার মধ্যে শাকল শাখাই সবচেয়ে সুবিদিত ও প্রচলিত। যজু সংহিতার দুটি ভেদ—কৃষ্ণযজুঃ ও শুক্লযজুঃ। যজু সংহিতার প্রচলিত শাখা হল তৈত্তিরীয় শাখা। সাম সংহিতার তিনটি শাখা হল—কৌথুম, রাণায়নীয় এবং জৈমিনীয়। অথর্ব সংহিতার দুটি শাখা হল—পিপ্পলাদ এবং শৌনক। তার মধ্যে শৌনক সংহিতাই আজকাল বেশী প্রচলিত।

বেদের বিভিন্ন শাখা

বেদের বহু শাখা থাকলেও প্রচলিত শাখাগুলি থেকেই বৈদিক ধারণার সুষ্ঠু পরিচয় পাওয়া যায়।

৩। চতুর্বেদের বিশদ বিবরণ (Detailed description of the four vedas) :

এইবার চারটি বেদের বিশদ পরিচয় লাভ করা যাক :

প্রথমেই ঋক্ সংহিতার পরিচয়। সংহিতাগুলির মধ্যে ঋক্ সংহিতাই সবচেয়ে প্রাচীন।[1] ঋক্-সংহিতাকে প্রাচীনতম মনে করার কারণ ঋক্ সংহিতার অনেক মন্ত্র অন্যান্য সংহিতায় দেখা যায়। ঋক্ সংহিতা কতকগুলি সূক্তের সমষ্টি। সু-উক্ত=সূক্ত অর্থাৎ শোভন বাক্য। সূক্ত কথাটির অর্থ স্তুতি, প্রশস্তি। এক একটি সূক্ত কতকগুলি ঋক্ বা মন্ত্রের সমষ্টি। সাধারণতঃ এক এক দেবতার উদ্দেশ্যে এক একটি স্তুতি দেখা যায়। কখনও কখনও এক সূক্তে কয়েকজন দেবতার স্তুতিও দেখা যায়। আগেই বলা হয়েছে যে, ঋগ্বেদের বিভিন্ন শাখার মধ্যে শাকল শাখাই সবচেয়ে সুবিদিত ও প্রচলিত। শাকল সংহিতায় মোট ১০২৮টি সূক্তে এবং ১০৫৫২টি ঋক্ আছে। শাকল সংহিতায় সূক্তগুলিকে দশটি মণ্ডলে ভাগ করা হয়েছে। মণ্ডলের উপবিভাগ হল 'অনুবাক'। অর্থাৎ কয়েকটি সূক্ত নিয়ে একটি অনুবাক এবং কয়েকটি অনুবাকের সমষ্টি হল এক একটি মণ্ডল। শাকল সংহিতায় মোট পঁচাশিটি অনুবাক আছে। শাকল সংহিতায় মন্ত্র সংকলন আংশিক। তার বাইরেও অনেক ঋকের সন্ধান পাওয়া যায়। অতিরিক্ত মন্ত্রগুলিকে খিলগ্রন্থ বা খিলকাণ্ড বলা হয়। 'খিলসূক্ত' বলতে বোঝায় শাকল সংহিতার বাইরে যে সব সূক্ত, যেগুলিকে শাকল শাখার অন্তর্গত মনে করে ঋগ্বেদের পরিশিষ্টরূপে প্রকাশ করা হয়। এই খিলসূক্তগুলি খুবই প্রাচীন। শুধুমাত্র শাখা-বহির্ভূত বলে তারা খিল বা পরিশিষ্টরূপে গণ্য হয়েছে। ঋক্-সংহিতার দু-ধরনের বিভাগ দেখা যায়—(১) মণ্ডল, অনুবাক,

ঋক্-সংহিতার পরিচয়

1. "The Rigveda is undoubtedly the oldest literary monument of the Indo-European languages."

Macdonell : "A Vedic Reader for Students."

সূক্ত ও ঋক্, (২) অষ্টক, অধ্যায়, বর্গ ও মন্ত্র। প্রথম বিভাগটি অনুষ্ঠানের এবং দ্বিতীয় বিভাগটি অধ্যয়নের পক্ষে উপযোগী। দ্বিতীয় বিভাগ অনুসারে ঋক্-সংহিতায় আটটি অষ্টক, চৌষট্টি অধ্যায় এবং দু-হাজার ছটি বর্গ আছে। কয়েকটি বর্গ নিয়ে একটি অধ্যায় এবং আটটি অধ্যায় নিয়ে এক একটি অষ্টক গঠিত।

যজ্ঞের ক্রিয়াকাণ্ডই সূক্তগুলির উপলক্ষ্য নয়। বহু সূক্তের উদ্দেশ্য 'যজ্ঞের ভূমিকারূপে একটা চিন্ময় আবহ সৃষ্টি করা।' আসলে যজ্ঞের ক্রিয়া-কাণ্ডকে উদ্দেশ্য করে যজুঃ মন্ত্র রচিত। ঋকের বেলায় কর্ম উপলক্ষ্য মাত্র।

এবার ঋক্-সংহিতার সঙ্গে যুক্ত ব্রাহ্মণের পরিচয় লাভ করা যাক। ঋক্-সংহিতার ব্রাহ্মণে আছে যজ্ঞের হোতৃকর্মের বিবৃতি ও ব্যাখ্যা।

ঋক্-সংহিতার দুটি ব্রাহ্মণ এখনও পাওয়া যায়—ঐতরেয় এবং কৌষীতকি ব্রাহ্মণ। কৌষীতকির আর একটি নাম শাঙ্খায়ন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ৪০টি অধ্যায় আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এতে অগ্নিহোত্র, সোমযাগের প্রকৃতি, অগ্নিষ্টোম, গবাময়ন, দ্বাদশাহ, রাজসূয় প্রভৃতি যজ্ঞের বিবরণ সংকলিত হয়েছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের দ্রষ্টা ঋষি মহিদাস। শাঙ্খায়ন বা কৌষীতকি ব্রাহ্মণের ত্রিশটি অধ্যায়ে সোমযাগ এবং অনান্য যাগের বিবরণ দেখতে পাওয়া যায়। ঋষি কৌষীতক এই ব্রাহ্মণের দ্রষ্টা বলে কৌষীতকী নাম হয়েছে। প্রথম ছয়টি অধ্যায়ে অগ্ন্যাধান অগ্নিহোত্র দর্শ-পৌর্নমাস যাগের বর্ণনা আছে ও পরবর্তী চব্বিশটি অধ্যায় সোমযাগের বর্ণনায় পূর্ণ। এই ব্রাহ্মণে নৈমিষ্যারণ্যের বিখ্যাত যজ্ঞের কথা উল্লিখিত আছে।

ঋক্-সংহিতার ব্রাহ্মণ

ব্রাহ্মণে আছে যজ্ঞের বিধান; আরণ্যকে তারই সূক্ষ্ম ভাবনা। সংহিতার প্রধান ব্রাহ্মণগুলির শেষ অংশই আরণ্যক। আরণ্যক কখনও ব্রাহ্মণের অঙ্গীভূত, কখনও পৃথক। ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণের পরিশেষ হল ঐতরেয়া-রণ্যক আর শাঙ্খায়ান ব্রাহ্মণের পরিশেষ হল শাঙ্খায়নারণ্যক। ঐতরেয় আরণ্যক পাঁচটি ভাগে এবং কৌষীতকি আরণ্যক পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। বেদের আরণ্যকের পর 'উপনিষদ'। ব্রাহ্মণের শেষ পর্ব যেমন আরণ্যক, তেমনি আরণ্যকের শেষ পর্ব উপনিষদ। আরণ্যক এবং উপনিষদ দুইই

ব্রাহ্মণের অন্তর্গত। ঋগ্বেদের দুটি উপনিষদ—ঐতরেয় আরণ্যকের অন্তর্গত ঐতরেয়োপনিষদ আর শাঙ্খায়নারণ্যকের অন্তর্গত কৌষীতকি উপনিষদ। দুটিই গদ্যে রচিত। ঐতরেয়োপনিষদের তিনটি অধ্যায়। মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল আত্মতত্ত্ব। অনেকে মনে করেন এই উপনিষদটিই সবচেয়ে প্রাচীন উপনিষদ। এই উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে সৃষ্টিরহস্যের বর্ণনা সংকলিত হয়েছে। আত্মা থেকেই সব কিছুর সৃষ্টি—বর্ণনায় এই সত্যই ব্যক্ত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আত্মার তিনটি জন্মের কথা এবং তৃতীয় অধ্যায়ে আত্মার স্বরূপের কথা অর্থাৎ 'আত্মা স্বরূপতঃ ব্রহ্ম'-এই সত্যটি বিবৃত হয়েছে। কৌষীতকি উপনিষদে দেবঋণ, পিতৃঋণ, প্রাণবিদ্যা ও আত্মবিদ্যার কথা আলোচিত হয়েছে।

চতুর্বেদের মধ্যে সামবেদের স্থান তৃতীয়। গীতিরূপ বেদমন্ত্রকে সাম[1] বলে। বৈদিক যজ্ঞে উদ্‌গাতা ও তাঁর সহকারিগণ উচ্চৈঃস্বরে সামগান করতেন। সামবেদের মন্ত্রগুলি ঋক্‌মন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। সামবেদ সংহিতায় মোট ১৮১০ মন্ত্র আছে। তার মধ্যে ৭৫টি মন্ত্র ছাড়া সবগুলি ঋগ্‌বেদের মন্ত্রের পুনরাবৃত্তি। তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই 'মন্ত্রগুলি ঋগ্‌বেদে গান রহিত এবং সামবেদে মন্ত্রগুলি সামগানযুক্ত অর্থাৎ গান সহিত'। ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলিতে সুর সংযোগ করলেই তা সামে পরিণত হয়। এই কারণেই ভাষ্যকার সায়নাচার্য্য ঋককে সামের কারণ ও 'আশ্রয়' রূপে অভিহিত করেছেন। 'গীতিরূপা মন্ত্রাঃ সামানি', গীতিরূপ মন্ত্রগুলিই সাম আখ্যা লাভ করেছে। ঋগ্বেদের মন্ত্রের মাধ্যমে দেবতাকে আহ্বান করা হয় আর সামবেদের মন্ত্রের দ্বারা দেবতার স্তুতিগান করা হয়। সামবেদের যে তিনটি শাখা বর্তমানে প্রচলিত সেগুলি হল—কৌথুম, জৈমিনী আর রাণায়নী।

সামবেদের পরিচয়

অন্যান্য বেদের মত সামবেদও সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদে বিভক্ত। সামবেদের কোন আরণ্যক নেই। ঋগ্বেদে যেমন কয়েকটি মন্ত্রের সমষ্টিকে সূক্ত বলে, তেমনি সামবেদে দশটি মন্ত্রকে দশতি বলে। এক এক অধ্যায়ে অনেক দশতি

---

1. 'সাম' ক্লীবলিঙ্গ সামন্ শব্দ থেকে নিষ্পন্ন। জৈমিনি সামের লক্ষন নির্ণয় করতে গিয়ে বলেন, 'গীতেষু সামাখ্যা'। এর অর্থ গীয়মান মন্ত্রের নাম সাম।

আছে। কৌথুমসংহিতাকে দু-ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—আর্চিক এবং গান। ঋক্‌মন্ত্রে সুর আরোপ করে গান করা হত। সেই সুরকে বলা হত সাম। ঋকের পারিভাষিক সংজ্ঞা তখন হত 'সামযোনি' বা যোনি। 'ঋক্ সাম্নাং যোনিঃ'। 'আর্চিক সামযোনি ঋক্‌মন্ত্রের সংগ্রহ আর গান হল তার স্বরলিপি।' ঋক্‌সংহিতার সব মণ্ডল থেকেই সামসংহিতার মন্ত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। সংহিতার আর্চিক অংশটির দুটি ভাগ—পূর্বার্চিক আর উত্তরার্চিক। পূর্বার্চিকে মন্ত্রগুলি দেবতা ও ছন্দ অনুসারে সাজানো। এটি চারটি কাণ্ডে বিভক্ত—আগ্নেয়, ঐন্দ্রেয়, পাবমান এবং অরণ্য। প্রথম তিনটি কাণ্ড হল ঋগ্বেদের প্রধান তিনটি দেবতার, অগ্নি, ইন্দ্র এবং পবমান সোমের মন্ত্রসংগ্রহ আর অরণ্যকাণ্ডে নানা দেবতার মন্ত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। যজ্ঞবিধি অনুসারে উত্তরার্চিকে মন্ত্রগুলি সাজানো হয়েছে। সুরগুলির স্বরলিপি সংহিতার যে অংশে সংকলিত হয়েছে তাকে বলে গান।

সামবেদের নয়টি ব্রাহ্মণের মধ্যে তিনটি প্রধান—জৈমিনীয় শাখার জৈমিনীয় বা তলবকার ব্রাহ্মণ, কৌথুমীয় এবং রাণায়নীয় শাখার তাণ্ড্য বা পঞ্চবিংশ বা প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ এবং মন্ত্র বা ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ। অবশিষ্ট ব্রাহ্মণগুলিকে অনুব্রাহ্মণ নামে অভিহিত করা হয়। জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ আট অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম তিনটি অধ্যায় কর্মকাণ্ড। অবশিষ্ট ভাগটির নাম উপনিষদ ব্রাহ্মণ যেটি আরণ্যক এবং উপনিষদের সংমিশ্রণ। তাণ্ড্য ব্রাহ্মণের আর জৈমিনীয় ব্রাহ্মণেব বিষয়বস্তু প্রায় একই। জৈমিনীয় ব্রাহ্মণে নানাধরনের আচার অনুষ্ঠানের বর্ণনা, পরলোকের রূপক বর্ণনা এবং 'সামবিধানে সংস্কারগত বিবিধ উদ্দেশ্যে মন্ত্রের প্রয়োগ' উল্লিখিত হয়েছে। সামবেদীয় ব্রাহ্মণে সোমযাগের বিবরণ পাওয়া যায়। সামবেদের আর একটি প্রধান ব্রাহ্মণ হল ছান্দোগ্য বা মন্ত্র বা উপনিষদ ব্রাহ্মণ। এর দশটি প্রপাঠক আছে। প্রথম দুটি প্রপাঠকে গৃহ্যকর্মের মন্ত্রের সংগ্রহ এবং অবশিষ্ট আটটি প্রপাঠকে ছান্দোগ্য উপনিষদ। এই তিনটি প্রধান ব্রাহ্মণ ছাড়া সামবেদের আরও ছোট ছোট যে পাঁচটি ব্রাহ্মণ আছে, সেগুলি অনুব্রাহ্মণ নামে পরিচিত।

সামবেদের ব্রাহ্মণ

সামবেদের উপনিষদ হল কেন এবং ছান্দোগ্য। কেনোপনিষদের প্রথম

দুটি খণ্ডের বক্তব্য হল বাক্, চক্ষু শ্রোত্র, মন এবং প্রাণ দিয়ে ব্রহ্মকে পাওয়া যায় না। কেনোপনিষদে 'কেন' অর্থাৎ কার দ্বারা এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এবং চন্দ্রসূর্য্য গ্রহ-নক্ষত্রাদি পরিচালিত হচ্ছে—এই প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে বিশ্বের উৎস ও আধার ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। বস্তুতঃ ব্রহ্ম জানা এবং অজানার বাইরে। ছান্দোগ্যোপনিষদ প্রাচীন উপনিষদগুলির মধ্যে অন্যতম। এই উপনিষদটি সামবেদের ছান্দোগ্য মন্ত্র বা উপনিষদ ব্রাহ্মণের পরিশেষ। এই উপনিষদটি আটটি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। তার মধ্যে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম অধ্যায় পর্য্যন্ত বেদান্ত-দর্শনের কার্য্যকারণবাদ, আত্মতত্ত্ব, জীব-ব্রহ্ম ঐক্য, ব্রহ্মের স্বরূপ বিচার প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। বেদের 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্য এই উপনিষদেই প্রথম শ্রুত হয়।

সামবেদের উপনিষদ

চতুর্বেদের মধ্যে যর্জুবেদের দ্বিতীয় স্থান। ঋক্ ও সাম ভিন্ন অবশিষ্ট বেদমন্ত্র যজুঃ নামে অভিহিত। 'শেষে যজুঃ শব্দ' অর্থাৎ ঋক্ ও সাম ভিন্ন যা অবশিষ্ট তাই হল যজুঃ—এই ভাবে জৈমিনি পূর্ব-মীমাংসাসূত্রে যজুঃ মন্ত্রের লক্ষণ নিরূপণ করেছেন। যজুর্বেদকে কখনও কখনও বলা হয় কর্মবেদ। 'দেবতার আবাহন ও প্রশস্তি পাঠ, তাঁর স্তুতিগান এবং তাঁর উদ্দেশ্যে হোমদ্রব্য আহুতি দান—এই তিনটি হল যজ্ঞের মুখ্যসাধন।' যিনি আহুতি দেন তিনি হলেন অধ্বর্য্যু। অধ্বর মানে যজ্ঞ। 'অধ্বরং যুনক্তি ইতি (অধ্বরযুঃ) অধ্বযুঃ। অর্থাৎ যিনি যজ্ঞকে রূপায়িত করেন তিনিই অধ্বর্য্যু। মন্ত্র স্মরণ করে তাকে আহুতি দিতে হয়। যজুসংহিতা এই মন্ত্রের সংকলন। যজ্ঞে ঋক্‌মন্ত্রে দেবতার আহ্বান করা হয়, সামমন্ত্রে দেবতার স্তুতিগান করা হয়। যজুঃমন্ত্রের দ্বারা দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদান করা হয়। যজ্ঞানুষ্ঠানের নিয়মাবলী, যজ্ঞের যাবতীয় প্রক্রিয়া এই বেদে পাওয়া যায়। যদিও যজুঃ অমিত, তবু যজুর গদ্যে একটা ছন্দ আছে।

যর্জুবেদের পরিচয়

যজুঃসংহিতার দুটি ধারা—কৃষ্ণ আর শুক্ল। যে সংহিতায় মন্ত্র আর ব্রাহ্মণের সংমিশ্রণ তা কৃষ্ণ, আর যে সংহিতায় শুধু মন্ত্রের সংগ্রহ তা শুক্ল নামে অভিহিত। সংস্কৃতে 'কৃষ্ণ' শব্দটির একটি অর্থ হল মিশ্রণ। যা মিশ্রিত তা কৃষ্ণ, আর যা অমিশ্রিত তা শুদ্ধ, শুক্ল। যজুঃসংহিতার বিভিন্ন শাখা আছে। তার মধ্যে

তৈত্তিরীয় শাখাই সর্বাধিক প্রচারিত। সায়নাচার্য্য কৃষ্ণ যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় সংহিতার ভাষ্য প্রণয়ণ করেছেন। এই শাখার ৭টি কাণ্ড বা ৪৪টি প্রপাঠক বা প্রশ্ন। ৬৪৪টি অনুবাক এবং ২১৮৪টি কণ্ডিকা বা মন্ত্র এই শাখায় সন্নিবদ্ধ আছে। যজুঃ সংহিতায় যে যজ্ঞগুলির উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি হল অগ্ন্যাধান (পুনরাধেয়), অগ্নিহোত্র, দর্শপৌর্ণমাস,[1] পশুযাগ, দীক্ষা, সোমযাগ, বাজপেয়, রাজসূয়, অশ্বমেধ, সৌত্রামণী এবং অগ্নিচয়ন। যজ্ঞ রহস্যের একটা বিস্তৃত বিবৃতি সর্বশেষ যাগটিতে পাওয়া যায়।

কৃষ্ণযজুর্বেদের কাঠকসংহিতার পৃথক কোনও ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় না। কিন্তু তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের তৃতীয় কাণ্ডের শেষ তিনটি প্রপাঠককে বৈদিকেরা কাঠক ব্রাহ্মণরূপে অভিহিত করেন। মৈত্রায়নীসংহিতারও পৃথক কোন ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় না। তার চতুর্থ বা শেষ কাণ্ডটি খিলকাণ্ড, যাকে ব্রাহ্মণ বলে গণ্য করা যেতে পারে। এক তৈত্তিরীয়সংহিতারই পৃথক ব্রাহ্মণ আছে। এই ব্রাহ্মণের তৃতীয় কাণ্ডের একাদশ প্রপাঠকে নচিকেতার গল্পটি বিবৃত হয়েছে। শুক্লযজুর্বেদ বা বাজসনেয় সংহিতায় চল্লিশটি অধ্যায়ে তিনশত তিন অনুবাক এবং ১৯১৫টি কণ্ডিকা আছে। এই সংহিতার মুখ্য বিষয়বস্তু হল দর্শপৌর্ণমাস যজ্ঞ, পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ, অগ্নিহোত্র যজ্ঞ, চাতুর্মাস্যাদি যাগের বিবরণ, অগ্নিহোত্র হোমের বিবরণ, গায়ত্রী মন্ত্র, সোম যাগের প্রকৃতি, অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের বিধান, রাজসূয় যজ্ঞ, সৌত্রামণী যাগ, অগ্নিচয়নের বিবিধ বিধান, অশ্বমেধাধি যজ্ঞের বিধান, প্রয়োজন বিধি, পুরুষমেধ, সর্বমেধ ও পিতৃমেধ যজ্ঞের বিবরণ। শুক্ল যজুর্বেদের শতপথব্রাহ্মণে একশত অধ্যায় আছে বলে তাকে শতপথব্রাহ্মণ বলে। গুরুত্বে এই ব্রাহ্মণটি ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে আছে। মাধ্যন্দিন ও কাম্ব নামে এই ব্রাহ্মণের দুটি শাখা আছে। ঋক সংহিতায় যেমন বৈদিক ঋষির মন্ত্র চেতনার দিকটি প্রকাশিত, শতপথব্রাহ্মণে তার মননের দিকটি প্রকাশিত। শতপথ-

কৃষ্ণ যজুর্বেদের পরিচয়

1. অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে যে ইষ্টি (এক ধরনের যাগ) করতে হয় তার নাম দর্শপৌর্ণমাস।

ব্রাহ্মণের প্রথম কাণ্ডে সব যজ্ঞের প্রকৃতি ও আদর্শের পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যান্য কাণ্ডগুলি থেকে অগ্নিহোত্র, পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ, রাজসূয়, অগ্নিচয়ন, অশ্বমেধ, পুরুষমেধ, সর্বমেধ, পিতৃমেধ, নবান্ন নামে ইষ্টি, চাতুর্মাস্য প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়।

কৃষ্ণযজুর্বেদের আরণ্যক হল তৈত্তিরীয় আরণ্যক এবং উপনিষদ হল মহানারায়ণ; মৈত্রায়ণ, তৈত্তিরীয়, কঠ এবং শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ। তৈত্তিরীয়োপনিষদে শিক্ষা ও জীবনাদর্শের একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। কঠোপনিষদে আছে আত্মবিদ্যা বা মৃত্যুবিদ্যা এবং যোগবিধির আলোচনা। এতে মৃত্যুরাজ যমের কাছে বালক নচিকেতার পরলোকতত্ত্ব, আত্মার স্বরূপ ও ব্রহ্ম বিদ্যা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা এবং তার উত্তরে যমরাজের আত্মতত্ত্ব বিশ্লেষণ মুখ্য স্থান অধিকার করে আছে। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে যোগের উল্লেখ আছে, কর্মের কোন উল্লেখ নেই। উপনিষদটির শুরুতেই রয়েছে বিশ্বের আদিকারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা। এক পরমদেবতাকেই জগৎকারণরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। এই উপনিষদে বেদান্ত দর্শন ও সাংখ্য দর্শনের সমন্বয় দেখতে পাওয়া যায়।

শতপথব্রাহ্মণের চতুর্দশ কাণ্ডটির নাম বৃহদারণ্যক এবং এই বৃহদারণ্যকই শুক্ল যজুর্বেদের একমাত্র আরণ্যক। এই বৃহদারণ্যকের শেষ দুটি অধ্যায় নিয়ে প্রসিদ্ধ বৃহদারণ্যকোপনিষদ রচিত। শুক্ল যজুর্বেদের দুটি উপনিষদ—ঈশোপনিষদ আর বৃহদারণ্যক উপনিষদ। ঈশোপনিষদটি সংহিতার অন্তর্গত, যে বৈশিষ্ট্য আর কোন উপনিষদের নেই। শুক্ল যজুর্বেদের শেষ অধ্যায় অর্থাৎ চত্বারিংশৎ অধ্যায়ের নামই ঈশোপনিষদ। মন্ত্রের অঙ্গীভূত বলে এই উপনিষদটিই একমাত্র মন্ত্রোপনিষদ। 'ত্যাগের দ্বারা ভোগ কর', কারও ধনে লোভ করো না—এই জাতীয় অনুশাসন দিয়ে উপনিষদটির শুরু। এই উপনিষদটির কতকগুলি ভাবনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ত্যাগ আর ভোগের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। জীবন তুচ্ছ নয়। নির্লিপ্ত হয়ে কর্ম করে যেতে হবে। আত্মাই সব কিছু। আত্মাতে সর্ব ভূতকে দেখতে হবে। সর্বভূতের মাঝে দেখতে হবে আত্মাকে —এই হল একাত্মার অনুভব। বৃহদারণ্যকোপনিষদ আয়তনে এবং গুরুত্বে যে

বৃহৎ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই উপনিষদটিতে ছটি অধ্যায় আছে। প্রতিটি অধ্যায় কয়েকটি ব্রাহ্মণের সমষ্টি। এর আলোচ্য বিষয় হল অশ্বমেধ-রহস্য, প্রাণোপসনা, আত্মবিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, সৃষ্টিরহস্য, ষোড়ষকলপুরুষতত্ত্ব, পিতাপুত্রীয়সম্প্রদান, প্রাণ ও বায়ুর তত্ত্ব। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য ও তার ব্রহ্মজিজ্ঞাসু পত্নী মৈত্রেয়ীর কথোপকথন এবং যাজ্ঞবল্ক্যের পত্নীকে পরমজ্ঞান দান এই উপনিষদেই কীর্তিত হয়েছে।

অথর্ব বেদের প্রবক্তারূপে তিনজন ঋষির নাম পাওয়া যায়—অথর্বা, অঙ্গিরাঃ ও ভৃগু। ঋক্ সংহিতার সঙ্গে অথর্ব সংহিতার ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে। অথর্ব-সংহিতার শৌনক শাখার ৭৩১টি সূক্তে ৫৯৮৭টি মন্ত্র আছে। সূক্তগুলি ২০টি কাণ্ডে এবং কাণ্ডগুলি প্রপাঠক এবং অনুবাকে বিভক্ত। সর্বসমেত কুড়িটি কণ্ডিকা, ৩৮টি প্রপাঠক, ৯০টি অনুবাক এবং ৭৩১টি সূক্ত এবং প্রায় ছ হাজার মন্ত্র আছে। পদ্য ও গদ্য, দু ধরনের মন্ত্রই দেখা যায়। তবে পদ্যেরই সংখ্যা বেশী। অথর্ব বেদের নটি শাখার মধ্যে বর্তমানে শৌনক ও পিপ্পলাদ—দুটি মাত্র শাখা পাওয়া গেছে। ঋগ্বেদ প্রকাশের অনেক পরে অথর্ববেদ প্রকাশিত হয়েছে। সপ্তমকাণ্ড পর্য্যন্ত নানা আভ্যুদয়িক কর্মের মন্ত্রই বেশী। সুতরাং সংহিতার এই ভাগটি গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনের পোষক এবং লোকহিতের অনুকূল।

অথর্ব বেদের পরিচয়

দীর্ঘায়ুলাভ, আরোগ্যলাভ, শ্রীলাভ, শত্রুনাশ, রাষ্ট্রের উন্নতি প্রভৃতির জন্যই এইসব আভ্যুদয়িক কর্মানুষ্ঠান। অষ্টম থেকে দ্বাদশকাণ্ড নিয়ে অথর্ব সংহিতার দ্বিতীয় ভাগ। এই ভাগে আভ্যুদয়িক কর্মের মন্ত্র থাকলেও, ঔপনিষদ ভাবনাই এই ভাগের বৈশিষ্ট্য সূচনা করে। ত্রয়োদশ থেকে বিংশ কাণ্ড পর্যন্ত অথর্ব-সংহিতার তৃতীয় ভাগ। এর প্রতিটি কাণ্ডের বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট। অথর্ব-সংহিতায় নানা ব্যাধির ও তার প্রতিষেধকের নাম দৃষ্ট হয়। প্রাকৃতিক চিকিৎসার উৎস অথর্ববেদ। অস্ত্রবিদ্যা ও অস্থিবিদ্যা বৈদিক যুগে কতখানি উন্নত ছিল তার প্রমাণ এই সংহিতায় পাওয়া যায়। এছাড়া শুভাশুভ-জনক মন্ত্র, সৃষ্টিতত্ত্ব, সৃষ্টিকর্তার তত্ত্ব ও অন্যান্য অধ্যাত্মতত্ত্ব অথর্ব সংহিতায় উল্লিখিত। অথর্ব বেদে কাল সম্পর্কে গভীর দার্শনিক তত্ত্ব আলোচিত

হয়েছে। কালেই সৃষ্টির প্রথম সূচনা। দ্যুলোক ও ভূলোক কাল থেকেই সঞ্জাত। অথর্ব সংহিতায় স্মার্ত কর্মের প্রাধান্য, যার লক্ষ্য অভ্যুদয় লাভ। অথর্ব বেদের সম্পর্ক অন্য তিন বেদের মত ধর্মের সঙ্গে নয়, ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে। তিন বেদের সম্পর্ক ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে, অথর্ব বেদের সম্পর্ক বৃহৎ কর্মের সঙ্গে। 'ঋগ্বেদ আর অথর্ববেদ এক অখণ্ড বেদবিদ্যারই প্রকাশক।'

অথর্বসংহিতায় একটি মাত্র ব্রাহ্মণ, গোপথব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণটির দুটি ভাগ—পূর্বভাগের পাঁচটি প্রপাঠক, উত্তর ভাগের ছয়টি। বিষয়বস্তুর অনেক খানিই অন্যান্য ব্রাহ্মণ থেকে ধার করা, অথর্ব সংহিতার সঙ্গে তার যোগ বিশেষ কিছুই নেই। এই ব্রাহ্মণে ছাত্রজীবন ও ব্রহ্মচর্য্যের কথা, ছাত্রজীবনের বিধি নিষেধ, অধ্যয়ন, পাঠক্রম, ভিক্ষাচর্যা, সমিদাহরণ, গুরুসেবা, ছাত্রের আচরণ প্রভৃতি লিপিবদ্ধ হয়েছে। যাগযজ্ঞের কথাও এই ব্রাহ্মণে আছে। অথর্ববেদের কোন আরণ্যক নেই।

অথর্ববেদের তিনটি উপনিষদ-প্রশ্ন, মুণ্ডক এবং মাণ্ডুক্য। প্রশ্নোপনিষদটি গদ্যে রচিত। মাঝে মাঝে কিছু শ্লোক আছে। প্রশ্নোপনিষদে ছটি প্রশ্ন বা অধ্যায় আছে। প্রত্যেক প্রশ্নে এক একটি প্রশ্নের সমাধান আছে। ব্রহ্মতত্ত্ব, পিতৃঋণ, প্রশ্নতত্ত্ব, দেবতাতত্ত্ব, প্রাণের উৎস, জীবের স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, সুষুপ্তি অবস্থার লক্ষণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির পার্থক্য, নিদ্রাবস্থায় পঞ্চ বায়ুর ক্রিয়া, ওঁকার সাধনা প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে জীবজন্ম, প্রাণতত্ত্ব, সুপ্তি বিজ্ঞান, ওঁঙ্কারোপাসনা এবং ষোড়শকলপুরুষবিদ্যা এই উপনিষদের প্রতিপাদ্য বিষয়। মুণ্ডকোপনিষদে রয়েছে ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা। মুণ্ডকোপনিষদ তিনটি মুণ্ডকে বিভক্ত। মুণ্ডক অধ্যায়ের নাম। প্রতিটি মুণ্ডক দুটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডে পরা ও অপরা বিদ্যা আলোচনা করা হয়েছে। ঐ মুণ্ডকেরই দ্বিতীয় খণ্ডে আছে অগ্নিহোত্র চাতুর্মাস্যাদি যজ্ঞের কথা। দ্বিতীয় মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডে ব্রহ্মের পারমার্থিক সত্যতার কথা এবং ব্রহ্ম থেকে নানাবিধ জীব উদ্ভূত হয়ে কিভাবে ব্রহ্মতেই বিলীন হয়ে যায়, তারই কথা বিবৃত হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে আছে প্রণব ওঁকার রূপে ব্রহ্মের ধ্যান ও ব্রহ্মোপাসনার কথা। তৃতীয় মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডে দেখি একই দেহে জীবাত্মা

পরমাত্মা একই আত্মার রূপভেদে একই বৃক্ষে আশ্রিত পক্ষীদ্বয়ের তুলনা। দ্বিতীয় খণ্ডে 'আমি পরমাত্মা'—এই অভেদানুসন্ধানের মাধ্যমেই যে পরমাত্মা লভ্য সেই বিষয়টি সকাম পুরুষের সাধন বিফলতা, ব্রহ্মবিদের ব্রহ্ম হওয়া প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে। মাণ্ডূক্যোপনিষদ বারটি মন্ত্রে রচিত। চতুর্মাত্র ওঁকারের তত্ত্ব প্রতিপাদ্য বিষয়। ওঁকারই সব, ব্রহ্মই সব, এই আত্মাই ব্রহ্ম, ওঁকারই আত্মা।

৪। বৈদিক মন্ত্রের মর্ম (The Spirit of the Vedic hymns):

বৈদিক মন্ত্রের মর্ম কি ?—এই প্রসঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ বিভিন্ন ধরনের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এই অভিমতগুলির মধ্যে যেগুলি উল্লেখযোগ্য সেগুলি নীচে আলোচনা করা হচ্ছে :

বিভিন্ন অভিমত

চতুর্বেদের ভাষ্যকার ভারতীয় পণ্ডিত সায়নাচার্যের মতে বৈদিক মন্ত্রগুলি বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশে প্রার্থনা স্বরূপ, যে দেবতাগুলি প্রাকৃতিক শক্তির মূর্ত রূপ। বেদের মধ্য দিয়ে আদি যুগের ধর্মের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে, এই ধর্ম হল প্রকৃতির উপাসনা। ডঃ রাধাকৃষ্ণন বলেন, 'ঋগ্বেদ এক অকৃত্রিম যুগের ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করে। মন্ত্রগুলি সরল ও স্বাভাবিক। পরবর্তী কালের কৃত্রিমতা থেকে এখনও পর্যন্ত যে মন মুক্ত, সেই মনের ধর্মীয় চেতনার প্রকাশক।"[1] আধুনিক কালের কোন কোন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতও উপরিউক্ত অভিমত পোষণ করেন। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত প্লিডারআর (Pfleiderer) আদিযুগের শিশুসুলভ ঋগ্বেদের প্রার্থনার কথা বলেন।

ব্লুমফিল্ড-এর অভিমত

পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত ব্লুমফিল্ড (Bloomfield)-এর মতানুসারে বৈদিক মন্ত্রগুলিতে যাগযজ্ঞের বিভিন্ন পদ্ধতির বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর মতে বেদ এক আদিম জাতির রচনা, যাঁরা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করতেন। বেদে যে দেবদেবীর উল্লেখ আছে, তাঁদের উদ্দেশ করেই যজ্ঞের আহুতি প্রদান করা হত। কাজেই বেদের মন্ত্রগুলির কোন গভীর তাৎপর্য্য নেই।

1, S. Radhakrisnan, History of Indian Philosophy, Vol. I. P. 69.

বারগেইন্ (Bergain)-এর অভিমতানুসারে সব বৈদিক মন্ত্র হল রূপক বর্ণনা। তাঁর মতে বৈদিক দেবদেবী সামাজিক আচার, প্রথা প্রভৃতির প্রতীক স্বরূপ।

বারগেইন্-এর অভিমত

কোন কোন ব্যক্তি বৈদিক মন্ত্রের মর্ম ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তার একেশ্বর-বাদী ব্যাখ্যা দিয়েছেন। পিকটেট্ (Pictet)-এর মতে একেশ্বরবাদ, তা সে যতই অস্পষ্ট হোক না কেন, এবং তার রূপ যতই আদিম হোক না কেন, ঋগ্বেদের বিভিন্ন মন্ত্রে স্পষ্ট প্রতীয়মান। রথ (Roth) এবং আর্য্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দও উপরিউক্ত অভিমতের সমর্থক। বেদে অসংখ্য দেবদেবীর বর্ণনা থাকলেও, এই বর্ণনার মধ্যে একেশ্বরবাদের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। অনেক মন্ত্রে দেবাদিদেবের উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। এর অর্থ হল বেদে অসংখ্য দেবদেবীর কথা বলা হলেও, পরমদেবতা একজন।

পিকটেট্-এর অভিমত

রথ এবং দয়ানন্দের অভিমত

কেউ কেউ বেদের অদ্বৈতবাদী (monistic) ব্যাখ্যা দিয়েছেন। রাজা রামমোহন রায় মনে করেন বেদের দেবদেবী এক পরম দেবতার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সূচক। বৈদিক মন্ত্রে যে দেব-দেবীর কথা বলা হয়েছে সেগুলি একই দেবতার ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ, যাকে সময় সময় মহেশ্বর নামে অভিহিত করা হয়েছে।

রামমোহনের অভিমত

কোন কোন সুধী ব্যক্তি বেদের অতীন্দ্রিয় ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যেমন, শ্রীঅরবিন্দের মতে বেদ অতীন্দ্রিয় দর্শন এবং অতি-প্রাকৃত জ্ঞানে পরিপূর্ণ। তাঁর মতে বৈদিক দেবদেবী মনোবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার প্রতীকস্বরূপ। যেমন, সূর্য্য, অগ্নি এবং সোম যথাক্রমে বুদ্ধি, ইচ্ছা এবং অনুভূতির প্রতীক। বেদ তাঁর চোখে এক অতি-প্রাকৃত ধর্ম। যে নীতির উপর বৈদিক মন্ত্রগুলি প্রতিষ্ঠিত তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ বলেন যে অতীন্দ্রিয়বাদীদের একটা নীতি হল আত্মজ্ঞানের পবিত্রতা এবং গোপনতা রক্ষা করা এবং দেবতাদের যথাযথ জ্ঞান লাভ করা। তাঁরা মনে করতেন এই জ্ঞান সাধারণ মানব মনের পক্ষে অনুপযোগী এবং বিপজ্জনক এবং যে আত্মা

অরবিন্দের অভিমত

নীচ এবং অপবিত্র তার কাছে এই জ্ঞান ব্যক্ত হলে তা বিকৃত হতে পারে বা তার যথোপযুক্ত প্রয়োগ নাও হতে পারে। সে কারণে সাধারণ ব্যক্তিদের জন্য তারা বাহ্য উপাসনার একটা পদ্ধতি নিরূপণ করে দিয়েছিল যা ফলপ্রসূ হলেও অপূর্ণ এবং ব্রতী ব্যক্তিদের জন্য এক অভ্যন্তরীণ নিয়মানুবর্তিতার (inner discipline) নির্দেশ করেছিল। এছাড়াও তাদের ভাষাকে এমন শব্দে এবং প্রতিরূপের দ্বারা পূর্ণ করে তুলেছিল যেগুলি মনোনীত ব্যক্তিদের জন্য এক আধ্যাত্মিক অর্থ বহন করত, এবং সাধারণ উপাসকমণ্ডলীর জন্য একটা স্থূল অর্থ বহন করত। শ্রীঅরবিন্দের মতে বৈদিক মন্ত্রগুলি এই ভাবনা ও নীতির উপর ভিত্তি করেই রচিত।

শ্রীঅরবিন্দের উপরিউক্ত অভিমত সায়নাচার্য্য, পূর্বমীমাংসকগণ এবং ইউরোপীয় পণ্ডিতদের আধুনিক অভিমতের বিরুদ্ধ অভিমত। ডঃ রাধাকৃষ্ণন শ্রীঅরবিন্দের উপরিউক্ত অভিমত গ্রহণ করেন নি। তিনি ঐ মতের সমালোচনায় বলেন, যে ভারতীয় চিন্তাধারার প্রগতি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে এমন কথা বলা যেতে পারে না যে বৈদিকমন্ত্রের পরমতম আধ্যাত্মিক সত্যের থেকে তা ক্রমশঃ দূরে সরে গেছে বরং মানুষের সাধারণ প্রকৃতির ক্রমবিকাশের সঙ্গেই এটা সামঞ্জস্যপূর্ণ। এরূপ সিদ্ধান্ত করাই সহজ যে পরবর্তীকালের ধর্ম এবং দর্শন আদিম মনের স্থূল ধারণা, প্রাথমিক নৈতিক ধারণা এবং আধ্যাত্মিক প্রত্যাশা থেকে উদ্ভূত ; মৌলিক পূর্ণতার কোন অবনতি নয়।

অরবিন্দের অভিমতের সমালোচনা

রাধাকৃষ্ণনের মতে বৈদিক মন্ত্রের মর্ম ব্যাখ্যা করতে গিয়ে, ঐ মন্ত্রের পরে যে ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের আবির্ভাব, তাদের অভিমত গ্রহণই যুক্তিযুক্ত। কেননা পরবর্তীকালের এই রচনাগুলিতে মন্ত্রগুলির যে বক্তব্য, তারই নিরবচ্ছিন্ন ধারা ও ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যায়। বাহ্য প্রকৃতির উপাসনা থেকে যখন আমরা উপনিষদের আধ্যাত্মিক ধর্মের অগ্রগতি লক্ষ্য করি, তখন ধর্মের স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের দিক থেকে তাকেই সহজে বোধগম্য মনে হয়। কেননা এই পৃথিবীতে সর্বত্রই মানুষ বাহ্য থেকে যাত্রা শুরু করে অন্তরের দিকে ধাবিত হয়েছে। উপনিষদ আদিম প্রকৃতির উপাসনার উপর কোন গুরুত্ব আরোপ

করেনি, বরং বেদের মধ্যে যে মহান ধর্মের ব্যঞ্জনা আছে তাকেই বিকশিত করে তুলেছে।

এই অভিমত আধুনিককালের ঐতিহাসিক পদ্ধতির এবং আদিম মনুষ্য সংস্কৃতি সম্পর্কে যে বৈজ্ঞানিক মত প্রদত্ত হয়েছে তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সায়নাচার্য্যের অভিমতের সঙ্গেও সঙ্গতিপূর্ণ।

কেহ কেহ মনে করেন উপরিউক্ত বিভিন্ন অভিমতগুলি যদিও আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর বিরুদ্ধ মনে হয়, তবু সেগুলি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে একই সত্যকে প্রকাশ করে। সব অভিমতগুলির মধ্যে কিছুটা সত্য আছে। বিভিন্ন ঋষি বিভিন্ন মন্ত্রের রচয়িতা। কাজেই তাদের অর্থ এবং তাৎপর্য্য বিচারে প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। বৈদিক মন্ত্রের উপরিউক্ত ব্যাখ্যার মধ্যে কোনোটিই পুরোপুরি যথার্থ নয়। বেদ কেবলমাত্র কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করে না। বেদের মধ্যে যেমন রয়েছে একদিকে দর্শন এবং ধর্ম, তেমনি অপরদিকে রয়েছে বিজ্ঞান এবং ইন্দ্রজাল। কাজেই সব মন্ত্রেরই একই জাতীয় ব্যাখ্যা যুক্তিযুক্ত নয়। আধ্যাত্মিক দৃষ্টির অনন্যত্বের কথা স্মরণে রেখে মনুষ্য জাতির বিবর্তনের এক আদিম স্তরের সামাজিক এবং ঐতিহাসিক পারপ্রেক্ষিতে বৈদিক মন্ত্রগুলির মর্ম ব্যাখ্যাই কারও কারও মতে সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত।

বিভিন্ন অভিমতগুলি একই সত্যকে প্রকাশ করে

৫। বেদের পরম লক্ষ্য (The Ultimate aim of the Vedas):

বৈদিক ঋষিগণ জাগতিক দুঃখকষ্ট সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। একদিকে যেমন প্রকৃতি বৈদিক ঋষিদের কল্পনা উদ্দীপিত করত, প্রকৃতির প্রতি তাদের কৌতূহলী করে তুলত, তেমনি জাগতিক দুঃখকষ্ট থেকে মুক্তিও তাদের অন্যতম কাম্য বস্তু ছিল। কাজেই পরিপূর্ণ জ্ঞান ও শান্তি উভয়ই ছিল বেদের লক্ষ্য। স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, "মানুষের পক্ষে পরম পদ ও মুক্তি লাভের জন্য যা কিছু আবশ্যক তা বেদেই বিদ্যমান।" যজুর্বেদীয় শতপথব্রাহ্মণে বলা হয়েছে

বেদের লক্ষ্য পরিপূর্ণ জ্ঞান ও শান্তি

'ধনপূর্ণ পৃথিবী দান করে মানুষ যে লোক জয় করে বেদত্রয় পাঠ করে মানুষ যে শুধু তার সমান ফল লাভ করে তা নয়। পরন্তু তার থেকে বহুগুণে অধিক অক্ষয় লোক প্রাপ্ত হয়।" বৈদিক ঋষিরা স্বাভাবিকভাবেই মৃত্যুকে জয় করার অভিলাষী ছিলেন। সে কারণেই বেদে দীর্ঘ আয়ুর জন্য প্রার্থনা করতে দেখা যায়। বিভিন্ন দেবতার সন্তোষ উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রার্থনার পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁরা অবহিত ছিলেন। প্রার্থনার ফলপ্রসূতায় তাঁদের পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। তাঁরা মনে করতেন সুখ দুঃখ সম্পর্কে, শাশ্বত ও অনিত্য সম্পর্কে, বার্দ্ধক্য, মৃত্যু এবং ভয় থেকে মুক্তি সম্পর্কে, এবং ইহলোক ও পরলোক এই উভয় জগত সম্পর্কে জ্ঞান 'অভয় জ্যোতি'-র উপলব্ধির ব্যাপারে প্রস্তুতিপর্ব। তাঁরা জ্ঞান এবং শান্তির জন্য প্রার্থনা করেছেন। পরম জ্ঞানের জন্য সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকায়, ব্যক্তি সর্বপ্রকার অহংকার বর্জন করে ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। মানুষের আত্মা এবং ঈশ্বর—এই দুইয়ের সংযোগের মধ্য দিয়েই জ্ঞান এবং শান্তি লাভ করা যেতে পারে। কাজেই বেদের মতে, যে জাগতিক দুঃখকষ্ট এই দুঃখময় জগতে, মানুষকে পীড়িত করে, অভয় জ্যোতির উপলব্ধিই তার হাত থেকে মুক্তি লাভের একমাত্র উপায় স্বরূপ।

আত্মা ও ঈশ্বর—দুই-এর সংযোগের মধ্য দিয়েই জ্ঞান ও শান্তি লাভ করা যেতে পারে

বৈদিক সাহিত্যের দুটি বিভাগ—জ্ঞানকাণ্ড এবং কর্মকাণ্ড। এই দুটি বিভাগ যথাক্রমে জ্ঞান ও যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানের দিকটি সূচিত করে। আধ্যাত্মিক চিন্তন এবং প্রার্থনা যথাক্রমে এই দুটির আলোচ্য বিষয়। ব্যক্তির প্রতিফল অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধরনের প্রার্থনা নির্দেশিত হয়েছে। সব ব্যক্তিই একই ধরনের উপাসনা ও প্রার্থনার উপযোগী নয়। যে ব্যক্তি ব্রতী নয়, তার উপাসনা ফলপ্রসূ না হয়ে অসুবিধার সৃষ্টি করে। সম্যক কর্ম এবং সম্যক আচরণ জ্ঞানের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়। কৃতপাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত, মিতাহার, চিন্তার প্রশান্তি এবং অন্তরের শুদ্ধিতা পরম সত্তাকে উপলব্ধি করার জন্য অবশ্যই প্রয়োজন। লোভ, অহংকার, ক্রোধ, ভণ্ডামি সর্বোতোভাবে বর্জনীয়

বৈদিক সাহিত্যের দুটি বিভাগ

সম্যক কর্ম ও জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা

পাপী ব্যক্তি, ঈশ্বর নিন্দুক, চোর ও ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষীর সংসর্গ পরিত্যজ্য। ঐন্দ্রজালিক এবং উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিগণ নারকীয় জীব। দেবতারাই কেবলমাত্র সাধুপথে চলেন, তাঁদের সত্যবাদী, গুণবান এবং যথাযথ কাজের অনুসরণকারী বলে বলা হয়েছে।

বেদ কর্মবাদ প্রচার করেছে। সৎকর্ম সাধনে অমরতা লাভ করা যায়, বেদের অনেক মন্ত্রে সুস্পষ্টভাবে একথা বলা হয়েছে। বেদের মতে মানুষকে এইজন্মে পূর্বজন্মে কৃত কর্মের ফলভোগ করতে হয়।

৬। বৈদিক দেবতা (The Vedic Gods):

ঋগ্বেদের বিভিন্ন মন্ত্রে একাধিক দেবতার স্তুতি করা হয়েছে। দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি প্রধান। মন্ত্রে দেবতাদের স্বরূপ, স্বভাব ও কার্যের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। বৈদিক সংহিতায় উল্লিখিত এই সব দেবতাদের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে জড় প্রকৃতির বিভিন্ন জড় বস্তু যেমন ঝড়, ঝঞ্ঝা, মেঘ, বিদ্যুৎ, বৃষ্টি, বন্যা, দাবাগ্নি প্রভৃতির অধিষ্ঠাতা রূপে এক একটি দেবতার কল্পনা করা হয়েছে।

দেবতা পার্থিব বস্তুর বাহ্য-প্রতীক

বেদে বর্ণিত প্রতি দেবতা এক একটি পার্থিব বস্তুর বাহ্য প্রতীক। 'এক একটি পার্থিব পদার্থের চৈতন্য সত্তা বা অধিষ্ঠাতা এক একটি দেবতা।' যেমন দৃশ্যমান পার্থিব পদার্থ অগ্নির চৈতন্যময় অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হলেন অগ্নি। মন্ত্রে এদের প্রশস্তি করা হয়েছে যাতে এই সব দেবতাদের পরিতুষ্ট করে এদের অনুগ্রহলাভ করা যায়।

প্রাচীন বৈদিক ঋষিগণ প্রকৃতিকে এক ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, আকাশ, রাত্রি, উষা সবকিছুকেই তাঁরা মনে করতেন ঐশ্বরিক। কাজেই বৈদিক ধর্মের আদিম রূপ হল প্রকৃতি পূজা।

বৈদিক ধর্মের আদিম রূপ প্রকৃতি পূজা

এর পরের স্তরে মানুষ দেবতাকে নিজের প্রতিরূপে গঠন করতে লাগল। অর্থাৎ এই সব প্রাকৃতিক শক্তিতে নরত্ব বা মানবীয় সত্তার আরোপ—এই হল

বৈদিক ধর্মের দ্বিতীয় স্তর। প্রকৃতির বিশেষ বিশেষ উল্লেখযোগ্য বস্তুতে মানুষ দেবত্ব আরোপ করল। সুতীব্র ধর্মীয় অনুভূতির মুহূর্তে, যখন মানুষ কোন বিপদ থেকে পরিত্রাণ লাভ করেছে বা প্রকৃতির প্রবল শক্তির উপর নিজের নির্ভরতাকে অনুভব করেছে তখন সে ঐ প্রাকৃতিক শক্তিতে দেবতার উপস্থিতি অনুভব করেছে। ঝড়ের মধ্যে সে শুনেছে দেবতার স্বর আর সমুদ্রের তরঙ্গে প্রত্যক্ষ করেছে দেবতার হাতছানি।

দ্বিতীয় স্তরে প্রাকৃতিক শক্তিতে দেবত্ব আরোপ

জগতের অপূর্ণতার বোধ ও মানুষের দুর্বলতার জন্য, বিপদে মানুষ নির্ভর করতে পারে, পথ প্রদর্শক মনে করতে পারে এমন কারও প্রয়োজন অনুভব করা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। সেই সময় আর কোন কিছুই আকাশের মতন মানুষের এই অসীমত্বের অনুভূতিতে সাড়া দিতে পারল না। চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র পরিবর্তিত হতে পারে, ঝড় উঠতে পারে কিন্তু আকাশ চিরস্থায়ী, অপরিণামী, শাশ্বত। 'দেব' বলতে যদিও প্রথমে দীপ্তিমানকে বোঝাত, পরবর্তী কালে যা কিছু দীপ্তিমান, যেমন সূর্য্য, আকাশ, নক্ষত্র, উষা, দিন সকল কিছুর ক্ষেত্রে 'দেব' শব্দটি প্রযোজ্য হল। পৃথিবীও দেবতার স্তরে উন্নীত হল। আকাশ এবং পৃথিবী ছিল প্রথমে শুধু বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। যেমন ব্যাপ্তি, উৎপাদন ক্ষমতা প্রভৃতি। পৃথিবীকে 'মধুদাতা', 'দুগ্ধেভরা, নানাভাবে' বর্ণনা করা হত। কিন্তু অতি শীঘ্রই আকাশ এবং পৃথিবী পিতামাতা, অবিনাশী, প্রভৃতি মানবীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হল। এ-ছাড়া বিভিন্ন নৈতিক গুণ যেমন মহানুভবতা, সততা, সর্বজ্ঞতা প্রভৃতি গুণও তাদের ক্ষেত্রে আরোপিত হল। পৃথিবী এবং আকাশকে পিতা-মাতারূপে কল্পনা করা হতে লাগল যাঁরা সব সৃষ্ট জীবকে প্রাণ দান করেন এবং তাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করেন। পরে দেবতাদের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই প্রশ্ন জাগল কে আকাশ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছে। এই সৃষ্টির কাজ আরোপিত হল অগ্নি, ইন্দ্র এবং সোম দেবগণের উপরে।

ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল তাদের বহু ঈশ্বরবাদী বৈশিষ্ট্য (polytheistic character)। ঋগ্বেদের মন্ত্রে বহু দেবতার উল্লেখ ও উপাসনার কথা আছে। মন্ত্রে. পৃথক পৃথক দেবতার কথা বলা হয়েছে।

ঋগ্বেদের মন্ত্রভাগে যে ধর্ম বা ঈশ্বর তত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায় সেটি বিশ্লেষণ করলে ঈশ্বর সম্পর্কীয় চিন্তাধারার তিনটি স্তর লক্ষ্য করা যায়। (১) বহু ঈশ্বরবাদ (Polytheism), (২) একেশ্বরবাদ (monotheism) এবং (৩) অদ্বৈতবাদ (monism)। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত এই তিনটি স্তর ছাড়া আরও একটি স্তরের উল্লেখ করেছেন সেটি হল 'একাতিদেববাদ' বা 'এক পরম সত্তায় বহু দেবতার মিলন' (henotheism)।

বেদের ঈশ্বরতত্ত্ব

'দেব ইব দেবতা' অর্থাৎ দেব ও দেবতা একই। দেব শব্দের নিরুক্তসম্মত অর্থ 'দীপ্তিদানাদি গুণবিশিষ্ট আত্মচৈতন্য'। 'এক সৎস্বরূপ বা আত্মচৈতন্যই নানা মন্ত্র হেতু নানা প্রকারে ও নানা নামে প্রকাশ পেয়ে থাকে।

দেব শব্দের অর্থ

প্রতি মন্ত্রের একজন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছে। সেই মন্ত্রের দ্বারাই সেই দেবতার আবাহন ও প্রশংসা করা হয়। 'দিব্' ধাতু থেকে দেবতা শব্দ নিষ্পন্ন। দিব্+অচ=দেবঃ, দেব+তল=দেবতা। দিব্ ধাতুর একাধিক অর্থ আছে। দিব্ ধাতুর একটি অর্থ হল তেজ বা জ্যোতির বিকিরণ। অতএব দেবতা শব্দের ধাতুগত অর্থ হল জ্যোতির্ময় জীব। দিব্ ধাতুর আর একটি অর্থ প্রকাশ পাওয়া। যিনি প্রকাশ পান, যিনি ভাস্বর, যিনি স্বপ্রকাশ, তিনিই দেবতা। আর দেব শব্দের অর্থ করতে গিয়ে নিরুক্তের রচয়িতা যাস্ক বলেন, 'দেবো দানাৎ বা দীপানাৎ বা দ্যোতনাদ্ বা ভাতি'। অর্থাৎ দান করেন যিনি তিনিই দেবতা। ঈশ্বর দেবতা কারণ তিনি সমগ্র জগতই দিয়েছেন। সূর্য্য, চন্দ্র এবং আকাশও দেবতা; যেহেতু তাঁরা সৃষ্ট জীবকে আলোক প্রদান করেন। আবার তিনিই দেবতা যিনি নিজে প্রকাশ পেয়ে অন্যকে প্রকাশিত করেন। দেবতা নিজে দীপ্তি পান এবং অপরকেও উদ্ভাসিত করেন। দেবতা দান করেন, এর অর্থ তিনি মানুষের অভীষ্ট পূরণ করেন।

'দিব' ধাতুর একাধিক অর্থ

স্বর্গলোকই দেবতাদের আবাস। দেবতাদের শরীর হল মন্ত্র শরীর। এই কথার তাৎপর্য্য হল ঋষিদের উচ্চারিত মন্ত্রগুলি অলৌকিক শক্তিশালী। স্বর্গলোকের অধিষ্ঠাত্রী সূক্ষ্ম শারীরিক দেবতাগণ মন্ত্রের অলৌকিক সূক্ষ্ম শক্তি

গ্রহণ করে পুষ্টি লাভ করেন। মন্ত্রই দেবতার আকার। মন্ত্রের দ্বারাই দেবতা দীপ্তি পেয়ে থাকেন। যিনি মন্ত্রদ্রষ্টা, তিনিই ঋষি। মন্ত্র-প্রয়োগের দ্বারা যাঁরা মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার সাক্ষাৎকার লাভ করেন তাঁরাই ঋষি। মন্ত্রের চৈতন্য বা অধিষ্ঠাত্রী হলেন দেবতা। চৈতন্য স্বপ্রকাশ, চৈতন্যের আলোকে সব জড়-পদার্থ প্রকাশিত হয়। কাজেই বিভিন্ন রূপে ও বিভিন্ন নামে ব্যক্ত দেবতাগণ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আত্মচৈতন্য বা ব্রহ্মেরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ।

দেবতাদের শরীর মন্ত্র শরীর

ঋগ্বেদের বিভিন্ন মন্ত্রে একাধিক দেবতার স্তুতি করা হয়েছে। কাজেই বেদে বহু দেবতার নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। বেদে অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, সূর্য্য, বিষ্ণু, সোম, বরুণ, পূষণ, মরুৎ, রুদ্র, সবিতা, আদিত্য, দৌ, ঋভু, যম, মিত্র, অশ্বিনী প্রভৃতি বহু দেবতার নাম এবং উষা, অদিতি, রাত্রি, পৃথিবী, সরস্বতী প্রভৃতি দেবীর নাম পাওয়া যায়।

বেদে বহু দেবতার নামের উল্লেখ

এই দেবতাদের সম্বন্ধে ধারণা প্রধানতঃ তিন ধরনের পদার্থকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। প্রকৃতির মহান রূপকে কেন্দ্র করে কতকগুলি দেবতার উদ্ভব যেমন—সূর্য্য, উষা, অগ্নি, সোম প্রভৃতি। কয়েকটি বিশেষ ক্রিয়াকে কেন্দ্র করে কতকগুলি দেবতার উদ্ভব যেমন—সবিতৃ, বৃহস্পতি প্রভৃতি দেবতা। এবং কয়েকটি অমূর্ত ধারণাকে যেমন—বিশ্বাস শ্রদ্ধা, ক্রোধ প্রভৃতি কেন্দ্র করে আবার কয়েকটি দেবতার উদ্ভব। শেষোক্ত দেবতারা কেবল মাত্র সম্বোধনের পাত্র ছিল এবং তাদের ক্রিয়াকলাপ তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। অনেক সময় অচেতন বস্তু যেমন প্রস্তর, অক্ষ (পাশা) ইতর প্রাণী, এমন কি মানুষের তৈরী কোন কোন বস্তুকেও শান্তি ও সমৃদ্ধি দান করার জন্য আহ্বান করা হত।

নিরুক্তকার যাস্কের মতে বেদের দেবতাবৃন্দকে দেবতাদের বাসস্থান ভেদে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন—ভূলোকের দেবতা, অন্তরীক্ষ লোকের দেবতা এবং দ্যুলোক বা স্বর্গের দেবতা। অগ্নি, অপ্, পৃথিবী ও সোম ভূলোকের অন্তর্গত। ইন্দ্র, বায়ু, রুদ্র, মরুৎ প্রভৃতি দেবতাগণ অন্তরীক্ষলোকের অধিবাসী এবং সূর্য্য, মিত্র, বরুণ দ্যুঃ, পুষা, আদিত্য, উষা, রাত্রি, প্রভৃতি স্বর্গ-

লোকের অন্তর্গত। এই তিন শ্রেণীর দেবতাদের মধ্যে একজন দেবত প্রধান এবং সেই দলের অন্যান্য দেবতারা তারই ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তি, যেমন—ভূলোকের দেবতাদের মধ্যে অগ্নিই প্রধান দেবতা। অন্তরীক্ষলোকের দেবতাদের মধ্যে মুখ্য হলেন ইন্দ্র বা বায়ু এবং দ্যুলোকের মুখ্য দেবতা হলেন সূর্য্য। নিরুক্তকার যাস্কের মতে, এই তিন জনই মুখ্য দেবতা। কাজেই মূলতঃ দেবতার সংখ্যা তিনটি মাত্র। যাস্কের মতে এই তিন দেবতার নানা অবস্থার ও নানা কর্মের উপর ভিত্তি করেই এক একটি দেবতার নাম হয়েছে। এ সম্পর্কে নিরুক্তের বচন হল—'তাসামেম ভক্তি সাহচর্য্যাদ বহুনি নাম ধেয়ানি ভবন্তি কর্ম পৃথকৃত্বাৎ' অর্থাৎ সেই তিন জন দেবতার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা বা ভিন্ন ভিন্ন কর্ম ভিন্ন ভিন্ন দেবতার নাম পেয়েছে। যেমন—অগ্নির ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া ও বিশেষণ নিয়ে বৈশ্বানর, জাতবেদা, নারাশংস, সুসমিদ প্রভৃতি নাম হয়েছে। তেমনি বায়ু থেকে মাতরিশ্বা, রুদ্র, ইন্দ্র, অপাংনপাৎ, মরুৎ প্রভৃতি দেবতার নামের উৎপত্তি হয়েছে। সূর্য্য থেকে আদিত্য, বিষ্ণু, মিত্র, বরুণ, পূষা, ঊষা, অশ্বিনীযুগল, সবিতা প্রভৃতি দেবতার উৎপত্তি হয়েছে। নিরুক্তকার সমস্ত দেবতাকে অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্য এই তিনটি দেবতাতে পরিণত করেছেন।

দেবতার সংখ্যা

বৈদিক গ্রন্থে সাধারণতঃ দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ বলে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু আসলে এই তিন দেবতা পরমাত্মা বা পরমব্রহ্মের তিন প্রকার অভিব্যক্তি। নিরুক্তকার যাস্ক বলেন, 'দেবতায়া এক আত্মা বহুধা স্তূয়তে' অর্থাৎ দেবতাদের এক আত্মা বহুরূপে অর্থাৎ বহু দেবতারূপে কীর্তিত হয়েছে।

মূল দেবতার সম্পর্কে মতবিভেদ

যাস্কের মতে সব দেবতার মূল রূপ হল অগ্নি। অগ্নিই অন্তরীক্ষে ইন্দ্ররূপে, বিদ্যুৎরূপে এবং দ্যুলোকে সূর্য্যরূপে প্রকাশিত। যাস্ক তাঁর অভিমতের সমর্থনে ব্রাহ্মণ গ্রন্থের 'অগ্নি সর্ব দেবতাঃ' বচনটি উদ্ধৃত করেছেন। কাত্যায়ণ তাঁর সর্বানুক্রমনী গ্রন্থে সূর্য্য বা আদিত্যকেই সব দেবতার মূলরূপ বলে বর্ণনা করেছেন। যাস্ক উভয় মতের সমন্বয় করে বলেন যে বেদে অগ্নি থেকে সূর্য্যের উৎপত্তির কথা যেমন বলা হয়েছে, তেমনি সূর্য্য থেকে অগ্নির জন্মের কথাও বলা হয়েছে।

কারও কারও মতে ঋষিরা দেবতাদের শরীরধারী চেতন সত্তারূপে বন্দনা করেছেন। বেদেও দেবতাদের মানুষের মত হাত, পা, চোখ, কান, মুখ প্রভৃতি আছে বলা হয়েছে, কাজেই দেবতারা শরীরধারী এরূপ মনে করা যেতে পারে। কিন্তু কেউ কেউ এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে দেবতারা শরীরধারী নয়; প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাব থাকাতে বিষয়টি প্রমাণ করা যায় না, স্তুতি করা হয়েছে বলেই দেবতারা চেতন ও শরীরধারী এই সিদ্ধান্ত করা চলে না। কেননা অক্ষ (পাশা), ঔষধ, প্রস্তর প্রভৃতি অচেতন পদার্থকেও স্তুতি করা হয়েছে। বেদে অচেতন পদার্থের যেমন রথের ক্ষেত্রে পুরুষযোগ্য কর্মাদি আরোপ করা হয়েছে। জৈমিনি পূর্বমীমাংসা গ্রন্থে দেবতাদের আকার ও চেতন পুরুষবৎ ব্যবহার স্বীকার করেননি। মীমাংসাদর্শন মতে মন্ত্রের অতিরিক্ত দেবতাদের কোন পৃথক সত্তা নেই। বেদান্তদর্শনে বেদব্যাস দেবতাদের পুরুষবৎ শরীরধারণ ও ব্যবহার সম্ভব বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। শ্রীশংকরাচার্য্য ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে বেদব্যাসের মত সমর্থন করেছেন এবং শ্রুতি ও স্মৃতি থেকে প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করেছেন। নিরুক্তকার যাস্ক এই দুটি মতের সমন্বয় সাধন করে আপন অভিমত প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর মতে দেবতারা সাকার ও নিরাকার, পুরুষবৎ ও অপুরুষবৎ উভয়ই। দেবতারা স্বরূপতঃ শরীরধারী কিন্তু যজ্ঞাদি কাজে শরীর নিয়ে উপস্থিত হন না। তাঁর ভাষায় তাঁদের স্ব-স্বরূপ পুরুষবিধ, কিন্তু কর্মরূপ অপুরুষবিধ। স্বরূপ বিচারে দেবতারা বিগ্রহযুক্ত, কিন্তু কর্মকালে তারা অশরীরী।

কারও কারও মতে দেবতারা শরীরধারী

উপরিউক্ত অভিমতের বিরোধিতা

দেবতাদের দুটি বিভাগ—আজানদেব এবং কর্মদেব। যেসব দেবদেবীকে দেবত্ব লাভের জন্য পুণ্যকর্ম সম্পাদন বা তপস্যা করতে হয় না তারা আজানদেব। যে সব দেবতা পূর্বে মনুষ্য ছিল, পুণ্যকর্ম বা তপস্যার বলে দেবত্ব লাভ করেছেন তারা কর্মদেব। যেমন—অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, সূর্য্য প্রভৃতি দেবতা আজান দেবতা। 'ঋভু' নামে দেবতা এবং অশ্বিনী দেবতাযুগল কর্মদেবতা। এরা প্রথমে দেবতা ছিলেন না, পরে পুণ্যকর্মের বলে দেবত্ব লাভ করেছেন।

দেবতাদের দুটি বিভাগ

বৈদিক দেবতাদের বৈশিষ্ট্যের দার্শনিক তাৎপর্য্য আলোচনা করতে গেলে দেখা যায়, যে এঁরা প্রকৃতির খুব কাছাকাছি। যেমন—অগ্নি, পর্য্যন্ত দেবতা, একাধারে দেবতা, আবার অপর দিকে প্রাকৃতিক বস্তু। গ্রীক দেবতা-তত্ত্বে যেমন দেবতাতে পুরোপুরি নরত্ব আরোপিত হয়েছে, বৈদিক দেবতাদের ক্ষেত্রে তা হয়নি। বৈদিক দেবতাদের ক্ষেত্রে নরত্বারোপ প্রতিহত বা অসম্পূর্ণ (arrested anthropomorphism)। এও একটা দার্শনিক মনোভাবের সূচক। বৈদিক ঋষির চিন্তাভাবনা এতই গভীর এবং পরম তত্ত্বের রহস্য সম্পর্কে তাঁর বোধ এতই তীব্র যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না একটা সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হচ্ছেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি প্রাকৃতিক ঘটনাকে নিজের কাছে দুর্বোধ্য করে তুলতে চান না। এই বৈশিষ্ট্য সত্যানুসন্ধানের আকাঙ্ক্ষা এবং দার্শনিক অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা সূচিত করে।

বৈদিক দেবতাতত্ত্বের দার্শনিক তাৎপর্য

এবার বৈদিক দেবতাদের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া যাক :

বৈদিক দেবতার পরিচয়

বেদের দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্রের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শৌর্য্যে, বীর্য্যে, মহিমায় তিনি অদ্বিতীয়। ঋগ্বেদের প্রায় এক চতুর্থাংশ সূক্তে ইন্দ্রের স্তুতি করা হয়েছে। ইন্দ্র শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ পরমেশ্বর। তিনি সকলের অধিপতি। ইন্দ্র হলেন নীল আকাশের দেবতা। জল এবং মেঘ থেকেই তাঁর জন্ম। তিনি বজ্রকে চালিত করেন এবং অন্ধকার দূরীভূত করেন। তিনি মানুষকে দেন আলোক, জীবন, প্রেরণা ও সজীবতা। তাঁকে দেখলে সমস্ত পৃথিবী থরথর করে কাঁপতে থাকে। ক্রমশঃ ইন্দ্র হয়ে পড়েন ঐশ্বরিক শক্তি, সমস্ত জগৎ ও জীবের শাসনকর্তা। তিনি যুদ্ধে অজেয়। তিনি দেবতাদের অধিপতি। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান শাসক। তাঁর পত্নীর নাম ইন্দ্রাণী। তিনি সোমরস পান করেন। বৃত্রকে বধ করার জন্য তাঁর আর এক নাম বৃত্রঘ্ন। তিনি জন্মগ্রহণ করেই শ্রেষ্ঠ মনস্বী, দ্যুতিমান। তিনি অন্য দেবতাদের জ্ঞানের দ্বারা অতিক্রম করেছেন। তাঁর শারীরিক শক্তিতে দ্যুলোক ও ভূলোক কম্পিত হয়েছিল। তিনি সব কিছু প্রত্যক্ষ করেন ও শ্রবণ করেন

ইন্দ্র

এবং মানুষকে উন্নত চিন্তা ও প্রেরণার দ্বারা অনুপ্রাণিত করেন। তিনি আকাশ, পৃথিবী, সমুদ্র, পর্বতের অধিকর্তা এবং সর্ব্বোচ্চ মর্যাদার পদ থেকে বরুণকে অপসারিত করে নিজেই তার স্থান দখল করেন।

আকাশের দেবতা হল বরুণ। 'বর' ধাতু, থেকেই বরুণ শব্দটির উৎপত্তি। বর শব্দটির অর্থ আবৃত করা। বরুণ হল আবরণকারী। ঋগ্বেদের বারটি সূক্তে বরুণ দেবতার আহ্বান করা হয়েছে। ঋগ্বেদের মুখ্য দেবতাদের মধ্যে তিনি একজন। তিনি সমস্ত পদার্থকে অন্ধকারে আবৃত করেন। মিত্র দেবতা হল বরুণের নিত্য সঙ্গী। বরুণ এবং মিত্র হল যথাক্রমে রাত্রি এবং দিন, অন্ধকার এবং আলোকের দেবতা। ক্রমে ক্রমে বরুণ হয়ে উঠল বেদের সবচেয়ে নৈতিক দেবতা। বেদে বরুণকে বিশেষভাবে নৈতিক জগতের নিয়ম ও শৃঙ্খলার রক্ষক বা অধিপতিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি জগতের উপরে দৃষ্টি রাখেন। তিনি পাপীদের দণ্ড দেন এবং যে সব পাপী তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করে তাদের ক্ষমা করেন। সূর্য্য হল তার চক্ষু, আকাশ হল তার পরিচ্ছদ এবং ঝড় হল তার নিঃশ্বাস। নদী তাঁর আদেশেই প্রবাহিত হয়, তাঁর আদেশে সূর্য্য কিরণ দেয়, নক্ষত্র এবং চন্দ্র তার ভয়ে নিজেদের কক্ষপথ আবর্তন করে। তিনি খেয়ালী দেবতা নন্। তিনি ধৃতব্রত অর্থাৎ স্থির সঙ্কল্পবিশিষ্ট। অন্যান্য দেবতা তাঁর আদেশ পালন করেন। তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান। তাঁর দৃষ্টি সুদূরপ্রসারী, সর্বত্রগামী। পাখী কোন পথে উড়ে যাবে, জাহাজ সমুদ্রে কোন পথে চলবে, সব কিছু সম্পর্কে তিনি পূর্ব থেকেই অবহিত। মানুষ যা কিছু পাপকার্য্য করে সবই তিনি জানতে পারেন। তাঁর দৃষ্টি এড়ান কারও পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি হলেন পরম দেবতা, দেবতার দেবতা। বরুণ দেবের প্রতি প্রার্থনায় পাপী সকল সময়ই তার পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। সকলেই বরুণকে ভয় করে ও পাপ থেকে পরিত্রাণের জন্য স্তুতি করে।

বরুণ

বরুণ দেব বিশ্বের যে নিয়মের বা শৃঙ্খলার রক্ষক তা 'ঋত' নামে পরিচিত। ঋত কথাটির আক্ষরিক অর্থ হল 'বিষয়বস্তুর গতি' (course of things)। ঋত সাধারণতঃ নিয়ম এবং ন্যায়পরতার অন্তঃস্থতা (immanence of justice) বোঝায়। সূর্য্য, চন্দ্র এবং নক্ষত্রের গতির নিয়মানুবর্তিতা, দিনরাত্রি এবং ঋতুর পরিবর্তনই হয়ত এই

ঋত

নিয়মের ধারণা দিয়েছে। কাজেই ঋত হল ঘটনার স্বাভাবিক নিয়ম। ধর্মের নিয়ম এবং নৈতিক নিয়মও চিরন্তন ও অলঙ্ঘ্য গণ্য হওয়াতে, ঋত শব্দ পরবর্তী সময়ে এগুলিকেও নির্দেশ করতে লাগল।

'ঋত' জগতের শৃঙ্খলা নির্দেশ করে। এই জগতের নিয়ম, শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্যের মূলে রয়েছে ঋত। যে জাগতিক শৃঙ্খলা চিরন্তন ও অলঙ্ঘ্য তাকে ঋত বলা হয়েছে। এই অভিজ্ঞতার জগৎ ঋত-এর ছায়াস্বরূপ। ঋত হল শাশ্বত সত্তা যা সব পরিবর্তনেও অপরিবর্তিত থাকে। সামান্য (universal) বিশেষের (particular) পূর্ববর্তী। কাজেই বৈদিক ঋষিরা মনে করেন যা কিছু প্রতীয়মান, ঋত তার পূর্ববর্তী। জগতের পরিণামী ঘটনাগুলি শাশ্বত ঋতের বিচিত্র প্রকাশ। কাজেই ঋতকে সব কিছুর পিতা নামে অভিহিত করা হয়। বিষ্ণু হল ঋতের ভ্রূণ। ঋতের জন্যই আকাশ এবং পৃথিবী যেমন তেমন। 'ঋত' শব্দের দ্বারা গ্রথিত একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে যে সব বস্তুই ঋত—এই অবিনাশী সত্তার বিকাশ। এই মন্ত্রটি হংসবতী ঋক নামে প্রসিদ্ধ।

ঋতের মাধ্যমে অতিন্দ্রিয় শাশ্বত সত্তার ধারণা

এক অতীন্দ্রিয় শাশ্বত সত্তার ধারণার প্রবণতা ঋতের ধারণার মধ্যেই প্রথম লক্ষ্য করা যায়। অপরিণামী নিয়মই হল প্রকৃত সত্তা, যা অনিত্য অবভাস তা হল তার অপূর্ণ প্রতিরূপ। যা শাশ্বত সত্তা তা অংশহীন ও অপরিণামী, বহুই পরিবর্তনশীল। বৈদিক ঋষিগণ বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনার অন্তরালে এক সর্বব্যাপী নিয়ম ও শৃঙ্খলায় বিশ্বাস করতেন। একেই বেদে ঋত নামে অভিহিত করা হয়েছে। ক্রমশঃ এই ঋত হয়ে উঠল এক সর্বব্যাপী নৈতিক নিয়ম। এই ঋত কেবল বহির্জগতের নিয়ম নয়, অন্তর জগতেরও নিয়ম। এই নিয়ম জীবজগতকে চালিত করে এবং ধর্ম ও নীতির সংরক্ষণে সহায়তা করে।

ঋতকে স্বীকার করে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেবতাদের প্রকৃতিতেও এক পরিবর্তন দেখা দিল। এখন বিশ্বজগৎ কোন আকস্মিক উপাদানের অন্ধ সমষ্টি মাত্র নয়, এক সামঞ্জস্যপূর্ণ উদ্দেশ্যমূলক ক্রিয়া।

মিত্র দেবতা বরুণ দেবতার সহচর। কাজেই বরুণের সঙ্গেসঙ্গেই মিত্রকে

আহ্বান করা হয় বা তার প্রশস্তি করা হয়। মিত্র কখনও বা সূর্য্য, কখনও বা আলোকের প্রতিনিধি। মিত্রও সবদ্রষ্টা, সত্যানুরাগী দেবতা। মিত্র এবং বরুণ ঋতের যুগ্ম-সংরক্ষক। ক্রমশঃ মিত্র উষার আলোকের সঙ্গে এবং বরুণ রাত্রিকালীন আকাশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ল। বরুণ এবং মিত্রকে অদিতির সন্তান বা আদিত্য নামেও অভিহিত করা হয়।

মিত্র

এর পরে সূর্য্য দেবতার উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রায় দশটি মন্ত্রে সূর্য্য দেবতার প্রশস্তি করা হয়েছে। সূর্য্য হল আলোক ও প্রাণদাতা। সূর্য্য দেবতাকে অলৌকিক শক্তির অধিকারী বলে মনে করা হত। যা কিছু স্থাবর, অস্থাবর সূর্য্য সব কিছুরই প্রাণ। তিনি হলেন সর্বদ্রষ্টা। তিনি মানুষকে কর্ম করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি অন্ধকার দূরীভূত করেন এবং আলোক দান করেন। সূর্য্য দেবতা হয়ে পড়েন জগতের স্রষ্টা এবং শাসনকর্তা। সূর্য্যের আলোক আকাশে অশ্বের মত দ্রুত গতিতে ছুটে আসে. তাই তাকে অশ্বযুক্ত বলে কল্পনা করা হয়েছে। সূর্য্যের রশ্মিই তাঁর অশ্ব। সূর্য্যের আর এক নাম বিষ্ণু। 'সূর্য্যের উদয়গিরিতে আরোহণ, মধ্য আকাশে স্থিতি এবং অস্তাচলে অস্তগমন —এই তিন পাদক্ষেত্র।'

সূর্যদেবতা

যে সবিতৃ দেবতাকে এগারটি মন্ত্রে প্রশস্তি করা হয়েছে, তিনিও এক সৌর দেবতা। সবিতা জগৎ প্রসবিতা। তাঁর থেকেই সব জীব জন্মলাভ করেছে। তাঁর তেজেই তৃণগুল্ম প্রাণ লাভ করে, মাটি ভেদ করে অঙ্কুর উদ্ভিন্ন হয়, জীব জন্মলাভ করে। সবিতৃ হল স্বর্ণচক্ষু, স্বর্ণহস্ত এবং স্বর্ণজিহ্বা বিশিষ্ট। তাঁকে সময় সময় সূর্য্য দেবতা থেকে পৃথক করা হয়, যদিও সাধারণতঃ উভয় দেবতাকে অভিন্ন গণ্য করা হয়। সবিতৃ শুধুমাত্র দিনের উজ্জ্বল সূর্য্য নয়, রাতের অদৃশ্য সূর্য্যও বটে।

সবিতৃ দেবতা

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক বিষয়, যাকে দেবতার পর্য্যায়ে উন্নীত করা হয়েছে, তা হল অগ্নি। প্রায় দুশত মন্ত্রে অগ্নি দেবতার প্রশস্তি করা হয়েছে এবং মর্য্যাদার গুরুত্বের দিক থেকে ইন্দ্রের পরেই অগ্নির স্থান। অগ্নি হল হোম

নিষ্পাদক, ক্রান্তপ্রজ্ঞ (বা ক্রান্ত কর্মা), অনৃতরহিত, যজ্ঞফলদাতা ও বিবিধ কীর্তিযুক্ত। দেবতাদের মধ্যে তিনি আমাদের সবচেয়ে নিকটতম। দেবতারা যজ্ঞের হবি অগ্নির মুখ দিয়ে আস্বাদন করেন। এই কারণে অগ্নিকে দেবতাদের মুখ বলা হয়েছে। 'অগ্নির্বৈ মুখং দেবানাম।' অগ্নি সকলের কল্যাণার্থে মনুষ্য গৃহে বহুরূপে বিরাজিত। অগ্নি সূর্য্যের মতনই দীপ্যমান। তিনি রাত্রির অন্ধকার দূর করেন। অগ্নি কেবলমাত্র পৃথিবীতে বা চুল্লীতে বা বেদীতে নেই। তিনি আকাশে এবং সূর্য্য, ঊষা ও মেঘে বিদ্যুৎ রূপে বিরাজমান। অগ্নি তাই হয়ে পড়ে এক প্রধান দেবতা। অগ্নির ব্যাপ্তি সর্বত্র। তিনি দ্যুলোকে, অন্তরীক্ষলোকে ও ভূলোকে সর্বত্র বিরাজ করেন। ক্রমে ক্রমে অগ্নি হয়ে পড়েন দেবতা ও মানুষের প্রতিনিধিস্বরূপ এবং সকলের সাহায্যকারী।

অগ্নি

সোমদেব হলেন প্রেরণার দেবতা, অমর জীবনের দাতা, মদ্য এবং দ্রাক্ষার দেবতা। দুঃখ জর্জরিত মানুষ কোন কিছুর মাধ্যমে তার দুঃখকে ভুলে থাকতে চায়। তাই যখন সে নেশাকর কোন পানীয় পান করে, তখন এক আনন্দের শিহরণ তার শরীরে বয়ে যায়। সে উন্মত্ত হয়ে পড়ে, সত্য, কিন্তু সে মনে করে এটা ঐশ্বরিক উন্মাদনা। সে মনে করে এটা কোন দেবতার ক্রিয়া। ক্রমশঃ সোম দেবতায় ব্যক্তিকে নীরোগ করার ক্ষমতা আরোপিত হয়। সোমদেব অন্ধকে দেখতে এবং খঞ্জকে চলতে সহায়তা করতে পারেন।

সোমদেব

পূষণ হল অপর এক সৌর দেবতা। 'পূষ' ধাতু থেকে পোষণ অর্থে পূষা শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। তিনি জীবলোক পোষণ করেন। পূষণ মানুষের বন্ধু এবং যাযাবর মেষপালকের দেবতা। কারও কারও মতে আর্য্যদের যে শাখা যাযাবর মেষপালক ছিল তারা পশুচারণের জন্য নতুন নতুন তৃণভূমির সন্ধান করত। পথে ভ্রমণের সময় বিপদের আশঙ্কা দেখলে তারা পূষার স্তব করত। তারা পূষার স্তব করে বলতেন, 'হে পূষা ! আঘাতকারী, অপহরণকারী ও দুষ্টাচারী কেউ যদি আমাদের ভিন্ন পথ দেখিয়ে দেয়, তুমি আমাদের সঠিক পথ দেখিয়ে দিও।'

পূষণ

ইন্দ্র, অগ্নি, সোম, বরুণ দেবতাদের পরে গুরুত্বে ও মহিমায় অশ্বিদেবতা যুগলের স্থান। প্রায় পঞ্চাশটি ঋক্‌ মন্ত্রে অশ্বিনী দেবতাদের প্রশস্তি করা হয়েছে। এই দেবতা সবসময়ই যমজরূপে উল্লিখিত। নামটির বুৎপত্তিগত অর্থ হল যার অশ্ব আছে। এরা আজানদেব নয়, কর্মদেব। এরা প্রথমে মানুষ ছিলেন, পরে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে দেবত্ব লাভ করেন। অশ্বিনীদেবের অপর এক নাম নাসত্য, অর্থাৎ যারা অসত্য নন বা সত্যভ্রষ্ট নন। এই দুই দেবতা সম্পর্কে নানারূপ অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে। কেউ বা বলেন এরা হলেন দিবারাত্র, কেউ বা বলেন চন্দ্র সূর্য্য, কেউ বা বলেন দুই পুণ্যবান রাজা। কেউ বা মনে করেন প্রত্যুষ ও প্রদোষ। 'উষা উদয়ের পূর্বে মিশ্রিত আলোক ও অন্ধকার যেন যুগ্ম দেবতা। কথিত আছে সূর্য্যের কন্যা সূর্য্যা অশ্বিদ্বয়কে স্বয়ম্বর সভায় পতিরূপে বরণ করেন। কারও মতে এই দুই দেবতা আকাশের সন্তান। উষা তাদের ভগ্নী। স্বর্গে ভিষক্‌ এঁদের বর্ণনা আছে। এঁরা হলেন বিস্ময়জনক ঘটনার ত্রাণকর্ত', দাম্পত্য প্রেমের সংরক্ষক এবং সকল রকম দুঃখের পরিত্রাণ কর্তা। অলৌকিক শক্তির দ্বারা এই দুই দেবতা মানুষকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। জনগণকে সাহায্য দান করা ও দুর্গতকে বিপদ থেকে রক্ষা করা এঁদের প্রধান কাজ। এরা বিচক্ষণ চিকিৎসক।

অশ্বিদেবতা যুগল

ঋগ্বেদে রুদ্র দেবতার উদ্দেশে মাত্র তিনটি সূক্তের ব্যবহার রয়েছে। 'রুদ্‌' ধাতুর একটি অর্থ গর্জন করা বা শব্দ করা। কাজেই রুদ্র হলেন তিনি যিনি শব্দ করেন। অর্থাৎ রুদ্র বজ্রের দ্যোতক। বজ্রপাত মাত্রই ভীষণ নির্ঘোষ। ঝড় ঝঞ্ঝা বাত্যার দেবতাবৃন্দ মরুৎগণের পিতা হলেন এই রুদ্র দেবতা। বেদে তার রূপের বিভিন্ন প্রকার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তিনি অপূর্ব দেহকান্তি, বলিষ্ঠ বাহু ও সুগঠিত ওষ্ঠাধরের অধিকারী। আবার তিনি 'ক্রূরকর্মা, ভীমদর্শন ও সংহারক'। ঋগ্বেদে রুদ্রের সংহারক ভয়ঙ্কর রূপের বর্ণনা পাওয়া যায়। কাজেই জীবলোকে তিনি ভয়ের পাত্র। তিনি খুব শক্তিশালী, ক্ষিপ্র গতিসম্পন্ন এবং যুদ্ধে অজেয়। ক্ষমতায় তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। মানুষ ও দেবতার সর্ববিধ আচরণ তিনি প্রত্যক্ষ করেন। শুক্ল যজুর্বেদের রুদ্রধ্যানে রুদ্রের শিবরূপের বর্ণনা দেখা যায়।

রুদ্র দেবতা

ঋগ্বেদে মরুৎ নামক দেবতাবৃন্দের এক বিশিষ্ট স্থান আছে। মরুৎ বলতে একজন নয়, একাধিক দেবতাকে বোঝায়। 'মরুৎ' শব্দটি 'মৃ'ধাতু থেকে উদ্ভূত; এর অর্থ হল আঘাতকারী বা ধ্বংসকারী ঝড়। কথিত আছে যে রুদ্র দেবতার ঔরসে পৃশ্নির গর্ভে মরুৎগণের জন্ম হয়েছিল। মরুৎগণের বাহ্য প্রত্যক্ষগ্রাহ্য প্রতীক হল ঝঞ্ঝা, বাত্যা, বিদ্যুৎ, মেঘ, বৃষ্টি প্রভৃতি। মরুৎ দেবতাবৃন্দ সু-যোদ্ধা, তাঁদের মস্তকে উষ্ণীষ, দেহে তনুত্রাণ ও স্বর্ণখচিত বর্ম এবং তাঁরা উজ্জ্বল পোষাকে সজ্জিত। অতি বেগবান অশ্ব চালিত সুবর্ণ নির্মিত রথে তাঁরা গমন করেন। মরুৎগণ ইন্দ্রের বন্ধু ও সখা। তাঁদের সাহায্যে ইন্দ্র বৃত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। আকাশে বায়ুর বেগ ও গতি যোদ্ধার অপ্রতিহত দুর্ধর্ষ বেগের সঙ্গে তুলনীয়। কাজেই মরুৎগণ যুদ্ধ-দেবতা। মরুৎগণকে দেবলোকের গায়করূপেও বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁরা গান করেন ও বংশীবাদন করেন। তাঁদের ঐ গান ও বংশীবাদন ঝঞ্ঝার সময়ে প্রভঞ্জনের বিচিত্র শব্দরাজি। মরুৎগণের উগ্র ও ভীষণ গতির ভয়ে মানুষ তাদের গৃহে দৃঢ় স্তম্ভ স্থাপন করে।

মরুৎ

এর পরে যম দেবতার উল্লেখ করা যেতে পারে। ঋগ্বেদের যম এবং পুরাণের যম এক দেবতা নয়। ম্যাক্সমূলার (*Maxmuller*)-এর মতে যম হল দিবা। যমের যমজ ভগ্নী যমী হল রাত্রি। তাঁর মতে এই দিবারূপী যমই ক্রমে মৃত্যুরাজে পরিণত হয়েছে। ঋগ্বেদে তিনটি মন্ত্রে যমদেবতার উদ্দেশ্যে প্রশস্তি করা হয়েছে, তিনি পরলোকে থেকে মৃতব্যক্তিকে সম্বর্দ্ধনা জানান। তিনি সেই রাজ্যের রাজা।

যম

পর্য্যন্য (Paryanya) হল আকাশের দেবতা। বেদে পর্য্যন্য হল আকাশের আর একটি নাম। অথর্ব বেদে পৃথিবীকে পর্যানের স্ত্রীরূপে কল্পনা করা হয়েছে। পর্য্যন্য হল মেঘের এবং বৃষ্টির দেবতা। তিনি দেবতা হিসেবে সমস্ত বিশ্বজগতকে শাসন করেন। সব জীবের তাঁতেই স্থিতি। যা কিছু গতিশীল তিনি তার প্রাণ স্বরূপ।

পর্যান্য

ঋগ্বেদে ব্রহ্ম হলেন বাক্যদেব বা প্রার্থনার দেবতা। এমন কি কখনও কখনও পুরোহিতরূপে তিনি মন্ত্রোচ্চারণ করেন। বৈদিক ব্রহ্ম, যার অর্থ প্রার্থনা, পুরানের সৃষ্টিকর্তা বিধাতা; ব্রহ্ম পৌরাণিক যুগে ঈশ্বরের ত্রিমূর্তির প্রথম মূর্তি।

ব্রহ্ম

উষা এবং অদিতি হল দেবী। সিন্ধু নদীকে দেবী হিসেবে একটি মন্ত্রে বন্দনা করা হয়েছে এবং সরস্বতী যা প্রথমে ছিল একটি নদীর নাম পরে হয়ে পড়ে বিদ্যার দেবী। বাক্ হল কথার দেবী। অরণ্যাণী হল বনদেবী।

উষা এবং অদিতি

যখন ধীরে ধীরে জড় থেকে আধ্যাত্মিকতার দিকে চিন্তার বিকাশ সুরু হল তখন অমূর্ত দেব দেবীর কল্পনা করা হতে লাগল। দেবতাদের কোন কোন গুণেও দেবত্ব আরোপিত হতে লাগল। ব্রহ্মণস্পতি হল পরবর্তীকালের দেবতা। যখন যজ্ঞের প্রচলন তখন তাঁর আবির্ভাব। মূলতঃ তিনি ছিলেন উপাসনার দেবতা। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে তিনি হয়ে পড়লেন যজ্ঞের দেবতা।

বেদের দেবতাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে হিরিয়ানা যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। তাঁর অভিমতানুসারে বৈদিক দেবতাদের এক বিশেষ অর্থে দেবতা বলে অভিহিত করা যেতে পারে। কেননা মানুষের ছাঁচেই দেবতাদের ধারণা করা হয়েছে। মানুষের মন যেমন কামনা বাসনায় বিচলিত, দেবতারাও তার ব্যতিক্রম নন। কাজেই বেদের দেবতারা হলেন মানুষেরই এক মহিমান্বিত রূপ। তাঁরা পুরোপুরি লৌকিকও নন আবার অলৌকিকও নন। হিরিয়ানার মতে এই সব দেবদেবীতে বিশ্বাসের যে একটা দার্শনিক ভিত্তি রয়েছে তা অস্বীকার করা চলে না। এই দার্শনিক ভিত্তি হল যে মানুষের মধ্যে এমন একটা ধারণা বা বিশ্বাস জন্মাল যে প্রত্যক্ষগ্রাহ্য জগতই শেষ কথা নয়; এই প্রত্যক্ষগ্রাহ্য জগতের অন্তরালে এক অপ্রত্যক্ষগ্রাহ্য সত্তা আছে। এই দেবদেবীতে বিশ্বাস আরও একটি বিষয় সূচিত করে সেটি হল প্রত্যক্ষগ্রাহ্য জগতের ব্যাখ্যা দেবার প্রচেষ্টা এবং এই বিশ্বাসও এর দ্বারা সূচিত হয় যে প্রত্যেক ঘটনার কারণ আছে। কার্য্য কারণ তত্ত্বের সার্বজনীনতায় বিশ্বাস করার অর্থ হল প্রকৃতির একরূপতায় বিশ্বাস করতে বাধ্য হওয়া। কেননা আদিম মানুষ যদি প্রাকৃতিক ঘটনার পুনরাবৃত্তির মধ্যে যে নিয়মানুবর্তিতা আছে তা লক্ষ্য না করত এবং যদি মনে মনে সে সুনিশ্চিত না হত যে প্রতিটি ঘটনারই একটা কার্য্য আছে, সে এই সব ঘটনার ব্যাখ্যার জন্য দেবদেবীর সৃষ্টি করত না। একথা

হিরিয়ানার অভিমত

সত্য যে আদিম মানুষের দেব-দেবীর ক্রিয়াকলাপের ধারণার মধ্যে সঠিক ব্যাখ্যা দেবার প্রচেষ্টা লক্ষিত হয় না। সে ঘটনাগুলিকে কতকগুলি দেবদেবীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করত মাত্র। তাছাড়া আদিম মানুষ যে প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যা দিচ্ছে এ সম্পর্কে সে সচেতন ছিল না। তবু বলা যেতে পারে যে বৈদিক দেবদেবীতে বিশ্বাস প্রাকৃতিক ঘটনার কারণ অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা সূচিত করে।

৬। বহু ঈশ্বরবাদ, একাতিদেববাদ বা 'এক পরম সত্তায় বহু দেবতার মিলন' ও একেশ্বরবাদ (Polytheism, Henotheism and Monotheism) ঃ

বেদে বহু দেবতার বর্ণনা লক্ষ্য করে অনেকে বেদকে বহু-ঈশ্বরবাদী (Polytheistic) বলে বর্ণনা করেছেন। আবার কেউ কেউ বেদকে একেশ্বরবাদী (Monotheistic) বলে বর্ণনা করেছেন। এই উভয় মতই একদেশদর্শী, কেননা বেদে একেশ্বরবাদ ও বহু-ঈশ্বরবাদ—উভয় প্রবণতাই লক্ষ্য করা যায়। গ্রীক বহু-ঈশ্বরবাদে বা পুরাণের দেবতাতত্ত্বে যেমন দেবতাদের একটা সুনির্দিষ্ট, সুসংহত এবং পৃথক সত্তা আছে, বৈদিক দেবতাদের সেরকম পৃথক সত্তা নেই। বিভিন্ন দেবতা তার পৃথক সত্তা হারিয়ে এক পরম দেবতায় সমন্বিত হয়েছে। প্রকৃতির কোলে থেকে সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিতে দেবত্ব আরোপ করেছিলেন। কোন বিশেষ সময়ে প্রকৃতির যে শক্তি তাঁদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল তাকেই তাঁরা পরম দেবতারূপে অভিহিত করেছেন।

কারও মতে বেদ বহু-ঈশ্বরবাদী, কারও মতে একেশ্বরবাদী

প্রাকৃতিক শক্তিতে দেবত্ব আরোপ

ঋগ্বেদের দেবতাতত্ত্ব আলোচনা করলে বোঝা যাবে যে, যে মন্ত্রে যখনই যে দেবতার স্তব করা হয়েছে তখন তাকে পরম দেবতা বলে অভিহিত করা হয়েছে। প্রত্যেক দেবতার মধ্যেই অপর দেবতা আশ্রিত। যেমন—অগ্নি দেবতাকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে, 'হে অগ্নি, অপর সব অমর দেবতাবর্গ তোমাতেই অবস্থিত।' "হে অগ্নি! তোমার ঐশ্বর্য্যেই দেবতাদের ঐশ্বর্য্য।" "মরুৎ

ঋগ্বেদের দেবতাতত্ত্বের পরিচয়

নামক দেবতাকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে মরুতের ক্রোড় আশ্রয় করেই দেবতারা নিজ নিজ ক্রিয়া সম্পাদন করেন। বরুণ দেবতার বর্ণনায় বলা হয়েছে, "রথচক্রের নাভিতে যেমন অর বা শলাকাগুলি গ্রথিত থাকে, বরুণদেবের মধ্যেও সেরূপ এই বিশ্ব গ্রথিত রয়েছে।" সোম দেবতাকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে, "হে সোম! তেত্রিশ সংখ্যক দেবতা, সকলেই তোমাতে অবস্থিত।"

এক পরম সত্তায় বহু দেবতার মিলন

যখন যে দেবতার স্তব করা হচ্ছে তখন তাকে পরম দেবতা বলে অভিহিত করা এই বিষয়টি লক্ষ্য করে ম্যাক্সমূলার (*Maxmuller*) বলেন যে আসলে বেদের যে দেবতাতত্ত্ব তাকে বহু-ঈশ্বরবাদ (Polytheism) বলে আখ্যাত না করে, একে একাতিদেববাদ বা 'এক পরম সত্তায় বহুদেবতার মিলন বলে' অভিহিত করাই শ্রেয়।

ঈশ্বরবাদের যথার্থ পরিণতি একেশ্বরবাদে

ঈশ্বরের যথাযথ ধারণা করতে গেলে একেশ্বরবাদ তার অনিবার্য্য পরিণতি। পরম দেবতা কেবলমাত্র একজনই হতে পারে। কারণ একই সঙ্গে একাধিক পরম ও অসীম সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করা চলে না। সৃষ্ট দেবতা কখনও দেবতা হতে পারে না। জগতের ক্রিয়া ও ঈশ্বরের প্রকৃতি সম্পর্কে যখনই অন্তঃদৃষ্টি জাগরিত হল তখনই বিভিন্ন দেবতা এক পরম দেবতায় মিশে গেল। 'ঋত'-এর ধারণার মধ্যে যে ঐক্যের উপলব্ধি প্রত্যক্ষ করা গেছে, সেটিই একেশ্বরবাদের ধারণাকে সুদৃঢ় করে তুলল। প্রকৃতির বিচিত্র ঘটনা যদি একাধিক দেবতার ধারণা সূচিত করে, প্রকৃতির ঐক্য কি একটিমাত্র ঈশ্বরের ধারণা সূচিত করে না, যে ঈশ্বর অস্তিত্বশীল সব কিছুকে ধারণ করে আছেন? প্রাকৃতিক নিয়মে বিশ্বাস করতে গেলে এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে হয়। বরুণের উপাসনায় এই একেশ্বরবাদের সুস্পষ্ট পরিচয় লক্ষ্য করা যায়।

অনেক পণ্ডিতের মতে বেদের গতি বহু ঈশ্বরবাদ থেকে এক পরম সত্তায় বহুদেবতার মিলনের দিকে। অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে বহু-ঈশ্বরবাদ, একাতিদেববাদ বা 'এক পরম সত্তায় বহু দেবতার মিলন', এবং একেশ্বরবাদ,

বৈদিক দেবতার ইতিহাসের বিবর্তনের পথে বিভিন্ন স্তর। মেকডোনাল (*Macdonell*) এই অভিমতের বিরোধিতা করেছেন। তাঁর মতে বৈদিক দেবতারা সম্পূর্ণভাবে পরস্পর নিরপেক্ষ নয়। বরং তারা পরস্পর নির্ভর। বরুণ এবং সূর্য্য ইন্দ্রের উপর নির্ভর; ম্যাকডোনালের মতে একাতিদেববাদ (Henotheism) অবভাস, (appearance), যথার্থ সত্য নয়। হিরিয়ানার ভাষায় এ হল সুবিধাবাদী একেশ্বরবাদ, (Opportunist monotheism)। একাতিদেববাদ (Henotheism) **এক দেবতায়** বিশ্বাস সূচনা করে, একেশ্বরবাদ **কেবলমাত্র একটি দেবতায়** বিশ্বাস সূচনা করে।

মেকডোনালের উপরিউক্ত অভিযোগের সমালোচনা

ম্যাকডোনালের বক্তব্য স্বীকারই করা হোক বা অস্বীকারই করা হোক না কেন, এটা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে বেদের ঈশ্বরতত্ত্ব বহু-ঈশ্বরবাদী নয়। রাধাকৃষ্ণন যথার্থই বলেছেন, যে বহু ঈশ্বরবাদকে স্বীকার করা চলে না, কেননা ধর্মীয় চেতনাই তার বিরোধিতা করে[1]। তাঁর মতে একাতিদেববাদ বা এক পরম সত্তায় বহু দেবতার মিলন হল একেশ্বরবাদের দিকে অজ্ঞাতসারে গতি (unconscious groping towards monotheism)।

রাধাকৃষ্ণনের অভিমত

ধর্মের যৌক্তিকতা যা বিভিন্ন দেবতাকে পরস্পরের মধ্যে মিলিয়ে দিতে চায়, একেশ্বরবাদ অভিমুখী একাতিদেববাদ বা এক পরম সত্তায় বহু দেবতার মিলন, 'ঋত'-এর ধারণা, এবং মানবমনের সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টা সবকিছুই বহু ঈশ্বরবাদী নরত্ব আরোপবাদকে অপসারিত করে আধ্যাত্মিক একেশ্বরবাদের স্থান করে দিয়েছে। এই সময় বৈদিক ঋষিগণ বিশ্ব জগতের একটিমাত্র সৃজনমূলক কারণ আবিষ্কারের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন, যেটি নিজে অবিনাশী এবং অসৃষ্ট। এই স্তরে বৈদিক মন চেয়েছিল প্রাকৃতিক ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করতে নয়, প্রাকৃতিক ঘটনার আদিম কারণটি অনুসন্ধান করতে। ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে জটিলতা পরিহারের ইচ্ছা মানবমনের স্বাভাবিক ধর্ম, হয়ত এই ইচ্ছার দ্বারাই প্রণোদিত হয়ে

প্রাকৃতিক ঘটনার আদি কারণের অনুসন্ধান

---

1. "We cannot have a plurality of gods, for religious consciousness is against it"— *S. Radhakrisnan :* Indian Philosophy Vol. I P. 91.

উঠেছিল বৈদিক মন। প্রত্যক্ষগ্রাহ্য ঘটনাকে একাধিক দেবতার সাহায্যে ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে পরিতৃপ্ত না হয়ে সে আবিষ্কার করতে চায় একটি মাত্র দেবতাকে, যে দেবতা সকল কিছুকে এবং সকল দেবতাকে নিয়ন্ত্রণ করেন। যে পরম দেবতার ধারণা এই স্তরে এমন ভাবে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল, সেটি আদিম যুগের চিন্তাধারার মধ্যেই প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজ করছিল। দেবতাদের মধ্যে অসম্পূর্ণ মানবধর্ম আরোপ করার জন্য এবং সূর্য্য, অগ্নি, উষা প্রভৃতি দেবদেবীর মধ্যে পারস্পরিক সাদৃশ্য থাকাতে বৈদিক দেবতাদের এক দেবতা আর এক দেবতাকে আবৃত করে রেখেছে। এক দেবতা ঠিক অপর দেবতার মত হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন দেবতার প্রকৃতি একই ভাবে চিত্রিত হয়েছে এবং নাম না থাকলে বোঝা কঠিন কোন দেবতাকে মন্ত্রে আহ্বান করা হচ্ছে। এই কারণেই হয়ত বৈদিক ঋষিদের মধ্যে যখন যে দেবতার স্তব করা হয়েছে, তাকেই পরম দেবতারূপে গণ্য করা হয়েছে এবং অন্যান্য দেবতাদের উপেক্ষা করা হয়েছে।

একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠার সহজ উপায়

বেদের প্রাচীন দেবতাদের একটি মাত্র দেবতায় উন্নীত করার একটি সহজ উপায় হল যে ঐ সব দেবতাদের মধ্যে যিনি খুব কতৃত্বব্যাঞ্জক, তাঁকে পরম দেবতার পদে উন্নীত করা। কিন্তু বৈদিক ভারতে তা করা হয়নি। বরুণ এবং ইন্দ্রকে এই ভাবে পৃথক পৃথক সময়ে পরম দেবতার পদে উন্নীত করার চেষ্টা হলেও কিন্তু তারা কেউ ব্যক্তিত্ববোধসম্পন্ন পরম দেবতার পদে অধিষ্ঠিত হতে পারে নি। কাজেই সাধারণতঃ একেশ্বরবাদ বলতে যা বোঝায়, তা যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

এই জাতীয় একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠার যুক্তিযুক্ত উপায় হল সমস্ত দেবতাকে এক উচ্চতর সত্তার অধীন করা, যিনি সব দেবতার কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারবেন। এই প্রক্রিয়া মানুষের এক ঈশ্বরের কামনাকে পরিতৃপ্ত করল।

বিভিন্ন দেবতাকে পরম দেবতায় অধিষ্ঠিত করার প্রবণতা

ঋগ্বেদের শেষোক্ত অংশে বিশ্বকর্মাকেই এই পরম দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত করা হয়। এমন কি ইন্দ্র ও বরুণের মত দেবতাকেও বিভাগীয় দেবতায় পরিণত করা হয়। বিশ্বকর্মা হলেন সর্বদ্রষ্টা, যার প্রতিদিকে চক্ষু, মুখ, বাহু ও পদ আছে। তিনি

তাঁর বাহুর সাহায্যে স্বর্গ ও মর্ত সৃষ্টি করেন। সব লোক তাঁর গোচরে, কিন্তু তিনি মরণশীল জীবের ধারণাতীত। কখনও কখনও বৃহস্পতিকে, কখনও বা প্রজাপতিকে, কখনও বা হিরণ্যগর্ভকে এই পরম দেবতার পদে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে।

৭। একেশ্বরবাদ বনাম অদ্বৈতবাদ (Monotheism versus Monism):

একেশ্বরবাদ বা একটি মাত্র পরম দেবতার ধারণাও মানুষের মনে পরিতৃপ্তি এনে দিতে পারল না। কেননা একেশ্বরবাদের ক্ষেত্রে অসংখ্য দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে যার মহিমা বেশী তাকেই পরম দেবতার পদে অধিষ্ঠিত করা হয়নি। কখনও বরুণকে, কখনও ইন্দ্রকে পরম দেবতারূপে অভিহিত করার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু কেউই পরম দেবতা হয়ে উঠতে পারেনি। কাজেই 'একেশ্বরবাদ' বলতে যথার্থভাবে যা বোঝায় তা বৈদিক যুগে কার্যকর হয়নি। তাছাড়া নরত্ব আরোপিত দেবতায় মানুষ খুশী হতে পারল না। পরবর্তীকালের বৈদিক চিন্তাবিদরা এই ধরনের একেশ্বরবাদে পরিতৃপ্ত হতে পারল না।

নরত্ব আরোপকারী ধারণার অবশ্যই বিলোপ সাধন দরকার। তারা আমাদের ঈশ্বরের প্রতিভূ (substituties) দিতে পারে, কিন্তু যথার্থ জীবন্ত ঈশ্বর দিতে পারে না। ঈশ্বর হবে এক, অনাদি, অনন্ত, সর্বব্যাপক এবং সর্বশক্তিমান। ঈশ্বর থেকেই সব কিছু নিঃসৃত হবে এবং ঈশ্বরেই ফিরে যাবে।

ঈশ্বরে ব্যক্তিত্ব (personality) আরোপ করার অর্থ ঈশ্বরকে সীমিত করা, অথচ ব্যক্তিত্বসমন্বিত ঈশ্বরই কেবলমাত্র উপাসনার বস্তু। ঈশ্বরে ব্যক্তিত্ব আরোপের অর্থ রূপহীনে রূপ আরোপ করা, অসীমকে সীমিত করা, অনন্তকে সান্ত করা। কাজেই সর্বনিরপেক্ষ পরম তত্ত্ব (Absolute)-কে উপাসনার বস্তুতে পরিণত করার অর্থ তার সর্বনিরপেক্ষতাকে ক্ষুন্ন করা।

এক সৎ-এর ধারণা

কিন্তু প্রকৃত ধর্মের প্রয়োজন, এক সর্বনিরপেক্ষ পরম সত্তাকেই। কাজেই ধর্ম ও দর্শন উভয়ের প্রয়োজন মেটাবার জন্য সর্বনিরপেক্ষ পরম সত্তাকে তিনি (He) বা ইহা (It) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই

এক ব্যক্তিগত ঈশ্বর (Personal God)-এর ধারণার বদলে এল সৎ-এর ধারণা, এক চৈতন্য সত্তার ধারণা। কোন দেবতার উপর পরম দেবতার সন্ধান না করে, সব দেবতার অন্তরালে যে সাধারণ শক্তি ক্রিয়া করে তাকে আবিষ্কার করার চেষ্টা হতে লাগল। বিভিন্ন দেবতাকে একই সত্তার প্রকাশ বলে বর্ণনা করা হল। ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে—

"ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নি মাহু রথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।
একং 'সৎ' বিপ্রা বহুধা বদন্তি অগ্নিং যমং মাতরিশ্বান মাহুঃ।"

অর্থাৎ যারা তত্ত্বদর্শী তারা একই সদবস্তুকে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি ও সুন্দর পক্ষযুক্ত গরুত্মান নামে অভিহিত করেন। অবার সেই সদ্‌বস্তুকে অগ্নি, যম ও মাতরিশ্বা (বায়ু) নামেও অভিহিত করা হয়।

আর একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে যে "একং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি" অর্থাৎ একই সদ্‌বস্তুকে তত্ত্বদর্শিগণ বহুনামে কল্পনা করে থাকেন। আর একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে—

"যমত্বিগো বহুধা কল্পয়ন্ত,
সচেতসো যজ্ঞমিমং বহন্তি।"

অর্থাৎ ঋত্বিকগণ একই বস্তুকে বহু নামে কল্পনা করে নিয়ে যজ্ঞ সম্পাদন করে থাকেন।

একেশ্বরবাদী ও অদ্বৈতবাদী ধারণার মিশ্রণ

এই পর্যন্ত যেগুলি বর্ণনা করা হল সেগুলির মধ্যে একেশ্বরবাদী ধারণার ও অদ্বৈতবাদী ধারণার মিশ্রণ দেখা যায় এবং এই দুই ধারণার মধ্যে পৃথক করা কঠিন। এদের মধ্যে যে একেশ্বর-বাদী ধারণা রয়েছে তাকে সঠিকভাবে বিচার করতে গেলে অদ্বৈতবাদী বলা চলে না। এই জাতীয় একেশ্বরবাদী ধারণার মধ্যে অবশ্যই দ্বৈতবাদ এসে পড়ে। কেননা এই একেশ্বরবাদে রয়েছে বিভিন্ন দেবতাকে এক দেবতায় পরিণত করার প্রবনতা যিনি জগৎ থেকে একটি স্বতন্ত্র

একেশ্বরবাদে যথার্থ অদ্বৈতবাদী মনোভাবের অভাব

সত্তা, জগতের যিনি নির্মাতা এবং পরিচালক। এই একেশ্বরবাদী ধারণায় ঈশ্বরের বিপরীতে প্রকৃতিকে উপস্থাপিত করা হয়েছে এবং এক বিশেষ অর্থেই কেবলমাত্র মানুষের ঐক্যের আকাঙ্ক্ষা এই একেশ্বরবাদী ধারণা পরিতৃপ্ত

করতে পারে। কিন্তু এই ঐক্যের তুলনায় এক উচ্চতর ঐক্যের ধারণা আছে তা হল অদ্বৈতবাদ যা সমগ্র অস্তিত্বশীল সত্তাকে একটিমাত্র উৎসের সাহায্যে ব্যাখ্যার জন্য চেষ্টা করে। উপনিষদে এই অদ্বৈতবাদী চিন্তাধারার সুস্পষ্ট পরিচয় আমরা লাভ করি। কিন্তু বেদে এর কিছু কিছু পরিচয় মাঝে মাঝে পাওয়া যায়।

বেদে অদ্বৈতবাদের পরিচয়

এই অদ্বৈতবাদী চিন্তাধারার দুটি রূপ আছে। একটি হল সর্বেশ্বরবাদী চিন্তাধারা, যেখানে ঈশ্বর ও প্রকৃতিকে অভিন্ন গণ্য করা হয়েছে। ঋগ্বেদের একটি সূক্তে এ জাতীয় ধারণার প্রকাশ ঘটেছে যেখানে দেবী অদিতি (সীমাহীন)কে সব দেবতা, সব মানুষ, আকাশ, বায়ু অর্থাৎ কিনা 'যা আছে, যা কিছু হতে পারে' তার সঙ্গে অভিন্ন গণ্য করা হয়েছে।[1] সর্বেশ্বরবাদে ঈশ্বর ও প্রকৃতিকে অভিন্ন গণ্য করা হয়। জগৎ ঈশ্বর থেকে উদ্ভূত নয়। জগৎ ও ঈশ্বর এক ও অভিন্ন। যদিও এই সর্বেশ্বরবাদ ঐক্যের কথা বলে, তবু এই ধারণা যেন ঈশ্বর ও প্রকৃতি দুই সত্তাকেই রক্ষা করতে চায় এবং সেহেতু প্রকৃত ঐক্য-সন্ধানী মানব মনকে তৃপ্ত করতে পারে না। কিন্তু যথার্থ ঐক্যের ধারণা প্রকাশ পেয়েছে ঋগ্বেদের প্রসিদ্ধ নাসদীয় সূক্তে। এই সূক্তে বিশ্বের সৃষ্টি রহস্যের বর্ণনায় এক নির্বিশেষ পরমসত্তার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সত্তা সৎ নন, আবার অসৎ নন। তিনি অনির্বচনীয়। তিনি সদাসতের অতীতাবস্থা। নাসদীয় সূক্তে সৃষ্টি রহস্যের বর্ণনায় বলা হয়েছে, 'তৎকালে পৃথিবীও ছিল না, আকাশও ছিল না, স্বর্গও ছিল না, ভোক্তাও ছিল না, ভোগ্যও ছিল না, আবরণও ছিল না, তখন মৃত্যুও ছিল না, অমরত্ব ছিল না, প্রাণীও ছিল না, দিনরাত্রি ছিল না। তিনি ছাড়া আর কেউ ছিলেন না।'

অদ্বৈতবাদের দুটি রূপ

সর্বেশ্বরবাদ অদ্বৈতবাদের জন্য ইপ্সিত মনকে তৃপ্ত করতে পারে না

নাসদীয় সূক্তে অদ্বৈতবাদ

বেদের নাসদীয় সূক্তে অদ্বৈতবাদী চিন্তাধারা

---

1. ১।৮৯।১০

উপরিউক্ত সূক্তে আমরা অদ্বৈতবাদী চিন্তাধারার সারবস্তুর সাক্ষাৎ পাই। এই সূক্তে একটি মাত্র পরম সত্তার কথা বলা হয়েছে এবং তার প্রকৃতি বর্ণনা করা হয়েছে। তার থেকে সমস্ত বিশ্বজগৎ নিঃসৃত। সৎ, অসৎ, মৃত্যু, জীবন, ভাল, মন্দ সব কিছুর আধার হল এই পরমতত্ত্ব। সৃষ্টিরহস্যের বর্ণনায় এখানে বলা হয়েছে কোন জগৎ-বহির্ভূত বাহ্য স্রষ্টার দ্বারা জগৎ সৃষ্টি হয়নি। প্রত্যক্ষগ্রাহ্য জগৎ এই অতীন্দ্রিয় আদি কারণের স্বতঃস্ফূর্ত আত্ম-বিকাশের ফলস্বরূপ। এই ধারণা নৈর্ব্যক্তিক এবং নির্বিশেষ এবং সবপ্রকার পৌরাণিক উপাদান বর্জিত। সর্বেশ্বরবাদে যে ঈশ্বরবাদী ধারণা রয়েছে, এই সূক্ত সেই ধারণামুক্ত। এই সূক্তে 'তদেকং' পদটির মধ্য দিয়ে একটি মাত্র পরমতত্ত্বের কথা বলা হয়েছে, যা সর্ব বিভেদবর্জিত। কাজেই এই সূক্তে আমরা উপনিষদের অদ্বৈতবাদী চিন্তাধারার দ্বারে এসে উপনীত হই।

৮। সৃষ্টিতত্ত্ব (Cosmology) :

বেদের সৃষ্টিতত্ত্বকে দুটি দিক থেকে বিচার করা যেতে পারে—পৌরাণিক (mythological) এবং দার্শনিক (philosophical)। অধ্যাপক ম্যাকডোনাল (*Macdonell*)-এর মতে এই পৌরাণিক দৃষ্টিভঙ্গীরও দুটি ধারা লক্ষ্য করা যেতে পারে। একটি ধারা অনুসারে এই বিশ্বজগৎ এক যান্ত্রিক সৃষ্টি, পরমেশ্বর প্রেরিত জগৎস্রষ্টৃগণের (হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি) দ্বারা নির্মিত, যেম সূত্রধর এবং তাঁর সহকর্মীদের দক্ষতারই পরিণতি। আর একটি ধারা অনুসারে জগতের উৎপত্তি স্বাভাবিকভাবেই সাধিত হয়েছে, জগত কারও দ্বারা নির্মিত নয়। সব পরিবর্তনের মূলে এক অপরিবর্তনীয় তত্ত্বের অনুসন্ধান করতে গিয়ে প্রাচীন গ্রীকদের মতন বৈদিক চিন্তাবিদগণ কখনও তাকে জল বা বায়ুরূপে কল্পনা করেছেন এবং জল, বায়ু প্রভৃতি আদিম

বৈদিক সৃষ্টিতত্ত্বের দ্বি-রূপ—পৌরাণিক ও দার্শনিক

পৌরাণিক দৃষ্টিভঙ্গীর দুটি রূপ

---

1. "The one regards the universe as the result of mechanical production, the work of carpenter's and joiner's skill, the other represents it as the result of natural generation." —*Macdonell's*: Vedic Mythology, P. 11

উপাদান থেকেই জগতের এই বৈচিত্র্যের সৃষ্টি—এইরূপ সিদ্ধান্ত করেছেন।

অসৎ থেকে জগতের উদ্ভব

জল থেকেই এই জগতের সৃষ্টি। সময় সময় আবার এই জলকেই রাত্রি, তমঃ বা বাতাস থেকে উদ্ভুত মনে করা হয়েছে। কখনও কখনও 'অসৎ' থেকেই জগতের উদ্ভব, এরূপ ধারণা করা হয়েছে এবং এই 'অসৎ'-কে 'অদিতি-র'সঙ্গে অভিন্ন গণ্য করা হয়েছে। যা অস্তিত্বশীল তাহল 'দিতি' বা সীমিত, আর অদিতি বা অসীম হল অসৎ বা অনস্তিত্বশীল। এই অসীম থেকেই জাগতিক শক্তিগুলির উৎপত্তি। যদিও সময় সময় এই জাগতিক শক্তিগুলিকেই অসীমের উৎস বলে গণ্য করা হয়েছে। এই মতবাদগুলিই অ-জাগতিক বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে এবং জাগতিক ও ধর্মের একত্র সংযোগ থেকে তাত্ত্বিক মতবাদের উৎপত্তি ঘটে।

বৈদিক চিন্তাধারায় যে স্তরে বহুদেববাদে বিশ্বাস সূচিত হয়েছিল, সেই স্তরে বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি, বিশ্বকর্মা প্রভৃতি বিভিন্ন দেবতাকে জগতের স্রষ্টা বলে মনে করা হত। জগতের সৃষ্টিকে ভিন্নভাবে ধারণা করা হয়েছে। সূত্রধর যেভাবে

সূত্রধরের মতন দেবতারা জগৎ নির্মাণ করেছেন

গৃহ নির্মাণ করে, কয়েকজন দেবতা সেভাবে জগতকে নির্মাণ করেছেন এরূপ ধারণা করা হয়েছে। প্রশ্ন করা হয়েছে যে, যে বনের বৃক্ষ ছেদন করে দ্যুলোক ভূলোকাদি জগতের নির্মাণ কার্য্য সাধিত হয়েছিল, সেই বনের নাম কি? তাদৃশ মহান বৃক্ষই বা কি ছিল? ঋক্ সংহিতায় যে প্রশ্ন করা হয়েছে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে তার উত্তর দেওয়া হয়েছে। "ব্রহ্ম বনং, ব্রহ্ম স বৃক্ষ আসীৎ" যে বনের যে বৃক্ষ থেকে দ্যুলোক-ভূলোক নির্মিত হয়েছে সেই বন ও বৃক্ষ উভয়ই ব্রহ্ম। ব্রহ্মই বনস্থানীয় ও ব্রহ্মই বৃক্ষস্থানীয়। ব্রহ্ম সর্বশক্তিযুক্ত বলে যে কার্য্যের জন্য যে সামগ্রীর প্রয়োজন তা ব্রহ্মেই বিদ্যমান।

বেদের একেশ্বরবাদী চিন্তার স্তরে প্রশ্ন দেখা দিল যে যখন কোন পূর্বস্থিত জড়ের অস্তিত্ব ছিল না, তখন ঈশ্বর কি তার নিজ প্রকৃতি থেকেই জগৎ সৃষ্টি

১ তৈ ব্রা ২।৮।৯

করলেন, বা পূর্ব থেকে অস্তিত্বশীল জড়ের উপর ঈশ্বর নিজ শক্তিকে প্রয়োগ করে কি জগৎ সৃষ্টি করলেন? প্রথমটি একেশ্বরবাদী চিন্তার উচ্চতর স্তর, দ্বিতীয়টি নিম্নতর স্তর। বেদের মন্ত্রে এই উভয় চিন্তারই প্রকাশ ঘটেছে। ঋক্ সংহিতায় ১০।১২১ সূক্তে এক সর্বব্যাপী ঈশ্বর পূর্বস্থিত জড় থেকে জগৎ সৃষ্টি করেছেন এরূপ বর্ণনা দেখা যায়। সৃষ্টির প্রারম্ভে যে বিস্তীর্ণ জলরাশি ছিল তার থেকেই হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি, যিনি এই সুন্দর জগৎ সৃষ্টি করেন। কিন্তু এই আদিম জলরাশির স্রষ্টা কে? মনু, হরিবংশ এবং পুরাণ অনুসারে ঈশ্বরই এই জলরাশির স্রষ্টা। ঈশ্বর নিজ ইচ্ছায় এই জলরাশি সৃষ্টি করেন, তাতে একটি বীজ নিক্ষেপ করেন যেটি একটি স্বর্ণনির্মিত ডিম্বে পরিণত হয়। সেখানে তিনি ব্রহ্মা বা স্রষ্টা ঈশ্বর রূপে নিজে জন্মগ্রহণ করেন। পরম চৈতন্যই হিরণ্যগর্ভ রূপে নিজেকে প্রকাশ করল। কাজেই অনন্তকাল থেকে স্থিত দুটি দ্রব্য এক পরম দ্রব্যেরই বিকাশ।

একেশ্বরবাদের—উচ্চতর ও নিম্নতর স্তর

জগৎ সৃষ্টির অপূর্ব রহস্যের দার্শনিক ব্যাখ্যা সর্বপ্রথম নাসদীয় সূক্তে লক্ষিত হয়। নাসদীয় সূক্তে সৃষ্টি রহস্যের বর্ণনায় বলা হয়েছে, "তৎকালে পৃথিবীও ছিল না, আকাশও ছিল না, স্বর্গও ছিল না, ভোক্তাও ছিল না, ভোগ্যও ছিল না, আবরণও ছিল না; তখন মৃত্যুও ছিল না, অমরত্বও ছিল না। প্রাণীও ছিল না, দিনরাত্রিও ছিল না। তিনি ছাড়া আর কেউ ছিলেন না।" এই সূক্ত থেকে জানা যায় জগৎ সৃষ্টির পশ্চাতে যে পরমতত্ত্বের অস্তিত্ব, তাকে সৎ বা অসৎ কোন ভাবেই বর্ণনা-করা যায় না। কেবল একের অস্তিত্ব ছিল, যে এক দেশাতীত, কালাতীত, মৃত্যু ও অমরতার অতীত। তপসের প্রভাবে এই আত্মা থেকে অনাত্মার সৃষ্টি। সচেতন পুরুষ ও অচেতন প্রকৃতি--এই দুই বিরোধী সত্তার মিথস্ক্রিয়া থেকেই জগতের অভিব্যক্তি। এই সূক্ত অনুসারে জগৎসত্তার মূলে রয়েছে কাম। কাম সৃষ্টির প্রেরণা এবং সমবেত মন বা বিশ্ব-মন এই কাম থেকেই উদ্ভূত। মনসরেতোঃ শব্দ পরবর্তী যুগে যাকে জীবাত্মা বা পুরুষ বলা

নাসদীয় সূক্তে জগৎ সৃষ্টির দার্শনিক ব্যাখ্যা

পুরুষ ও প্রকৃতির উল্লেখ

হয়েছে তাকে বোঝাচ্ছে। কতকগুলি সূক্তে পুরুষ ও প্রকৃতি এই দুই তত্ত্বের উল্লেখ দেখা যায়।

১০।৮২।৫-৬ সূক্তে বলা হয়েছে যে সমুদ্রের জলরাশিতে ছিল সৃষ্টির প্রথম বীজ। এই বীজ হল ব্রহ্মাণ্ড যা আদিম জলে ভাসমান। তার থেকেই জগৎস্রষ্টা বিশ্বকর্মার আবির্ভাব। বিশ্বকর্মা জগৎ সৃষ্টির ইচ্ছা করলেন এবং তার ইচ্ছাতে বিভিন্ন জগৎ, জল, আলোক প্রভৃতির সৃষ্টি হল। নাসদীয় সূক্তমতে জগৎ ও আত্মা একই অদ্বৈত সত্তার দুটি দিক। এই অদ্বৈত সত্তা আত্মাও নয়, অনাত্মাও নয়, উভয়কে অতিক্রম করে এক উচ্চতর চৈতন্য সত্তা।

মায়ার অর্থ ঈশ্বরের ক্ষমতা

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে ঋগ্বেদের সূক্তে জগতের অনস্তিত্বের কথা বলা হয়নি। জগৎ ঈশ্বরেরই অভিব্যক্তি। বেদের যেখানে যেখানে 'মায়া' শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে মায়ার অর্থ ঈশ্বরের ক্ষমতা।

প্রথমে এক অসৎ-এর অস্তিত্ব ছিল, যার থেকে সৎ-এর উৎপত্তি, এই বিষয়টি কিন্তু নাসদীয় সূক্তের বক্তব্য নয়। কারণ সৃষ্টির আদিতে যে তত্ত্বের অস্তিত্ব ছিল তাকে অসৎ বা সৎ বলা যুক্তিযুক্ত নয়। কেননা সৎ ও

নাসদীয় সূক্তের প্রকৃত তাৎপর্য

অসৎ অনন্যোনিরপেক্ষ পদ। সেগুলি, যে 'এক' সকল বিরোধিতার উর্দ্ধে, তার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতে পারে না। অসৎ বলতে বোঝায় যে, বর্তমানে যা প্রত্যক্ষগ্রাহ্য তখন তার অস্তিত্ব ছিল না। ১০।৭২-১ সূক্তে বলা হয়েছে যে, অসৎ-এর থেকেই সৎ-এর উদ্ভব। কিন্তু এক্ষেত্রেও তার অর্থ হল নির্বিশেষ থেকে বিশেষ-এর উদ্ভব।

পুরুষ সূক্তে এক আদিম উপাদান থেকে জগৎ সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। দেবতারা হল জগৎ স্রষ্টা, এবং যে উপাদান থেকে জগতের সৃষ্টি তা হল মহান পুরুষের শরীর। কাজেই সৃষ্টিক্রিয়া হল উৎসর্গের ক্রিয়া (act of sacrifice)। তাঁর মন থেকে চন্দ্রের জন্ম, অক্ষি থেকে সূর্য্যের; মুখ থেকে ইন্দ্র ও অগ্নির এবং নিঃশ্বাস থেকে বায়ুর। নাভি থেকে মধ্য অঞ্চল, মস্তক থেকে আকাশ, পদ থেকে পৃথিবীর, কর্ণ থেকে চতুর্থাংশের সৃষ্টি। হিরিণ্যা

এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন যে এ হল দৃষ্ট সমগ্রের অংশে বিভক্ত হওয়া, যা উপনিষদের প্রক্রিয়ার বিপরীত। সাধারণ অভিজ্ঞতায়, দেখা যায় প্রদত্ত একাধিক অংশ থেকে সমগ্রকে সংগঠিত করা হয়। এক অদ্বৈত সত্তা থেকে জগৎ সৃষ্টি—এই অভিমতের সঙ্গে এই সূক্তটির কোন বিরোধ নেই। পরম তত্ত্বই সক্রিয় পুরুষে পরিণত হয়েছে। কারণ বলা হয়েছে, 'পুরুষ থেকে বিরাটের জন্ম এবং বিরাট থেকে আবার পুরুষের জন্ম। পুরুষই জন্মদাতা এবং পুরুষই জাত, পুরুষই অদ্বৈত সত্তা, আবার আত্মসচেতন অহং'।

ঋগ্বেদের কোন কোন সূক্তে সৃষ্টি একবার মাত্র হয়েছিল এরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়[১]। কিন্তু সৃষ্টি ও প্রলয় পরম সত্তায় নিরবচ্ছিন্নভাবে ঘটছে[২] এমন উল্লেখও পাওয়া যায়।

৯। আত্মা (Soul) :

কোন কোন অস্বাভাবিক অবস্থায় আত্মাকে দেহ থেকে স্বতন্ত্র করা যেতে পারে—বেদে এমন বিশ্বাসের সন্ধান পাওয়া যায়। বেদে এমন বিশ্বাসের কথাও বলা হয়েছে যে মূর্চ্ছিত অবস্থায় আত্মা দেহ থেকে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করতে পারে এবং মৃত্যুর পরেও আত্মার অস্তিত্ব থাকতে পারে। পুনর্জন্ম সম্পর্কীয় মতবাদের কোন সুস্পষ্ট রূপের সন্ধান আমরা বেদে কোথাও পাই না। আসলে বৈদিক আর্য্যদের ছিল জীবনের প্রতি গভীর অনুরাগ। জীবনকে পরিপূর্ণভাবে তাঁরা ভালবাসতেন। কাজেই আত্মার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁদের বিশেষ কোন আগ্রহ ছিল না। হয়ত সেই কারণেই মৃত্যুর পরে জীবনের কী অবস্থা হয় সে সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট মতবাদ তাঁরা প্রতিষ্ঠা করেন নি। বৈদিক আর্য্যগণ মৃত্যুতেই সকল কিছুর পরিসমাপ্তি মনে করতেন না। রাত্রির পর যেমন দিন দেখা দেয়, মৃত্যুর পরেও জীবনের দেখা মিলবে এই ছিল তাঁদের বিশ্বাস; যাদের একবার জন্ম হয়েছে তারা কখনও চিরকালের মত ধ্বংস হয়ে যেতে পারে না।

১। ঋঃ সং ৬।৪৮।২২, ১০।৭৪।৬ ;

২। অথ ১০।৮।২৯, ৩৯।৪২, ঋ° সং ১০।৯০।২

শতপথব্রাহ্মণে বলা হয়েছে যে যাঁরা যথাযথ জ্ঞান ব্যতিরেকে যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন তাঁরা মৃত্যুর পরে আবার জন্মগ্রহণ করেন এবং আবার মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ঋগ্বেদে আত্মা শব্দটিকে বোঝানোর জন্য মনস, আত্মা এবং অসু এই তিনটি শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ঋগ্বেদের একটি সূক্তে[১] একজন অচেতন মানুষের আত্মাকে (মনস) বৃক্ষ, লতাগুল্ম, আকাশ, সূর্য্য থেকে তার কাছে আসতে বলা হয়েছে। অনেক সূক্তে এই বিশ্বাস সূচিত হয়েছে যে অন্য একটি জগতের অস্তিত্ব আছে যেখানে যাগযজ্ঞ সম্পাদনের ফলে চরম জাগতিক সুখ ভোগ করা যায়, এবং নরকের অস্তিত্ব আছে যেখানে পাপীকে তার দুষ্কর্মের জন্য শাস্তি প্রদান করা হয়। শতপথব্রাহ্মণে আমরা দেখি যে মৃত ব্যক্তিদের দুটি আগুনের মধ্য দিয়ে যেতে হয় যা পাপীদের দগ্ধ করে কিন্তু সৎ ব্যক্তিদের ক্ষতি করে না।[২] সেখানে আরও বলা হয়েছে যে মৃত্যুর পরে প্রত্যেককেই আবার জন্মগ্রহণ করতে হয়। তাকে তুলাদণ্ডে ওজন করা হয় এবং তার সৎ বা মন্দ কার্য্যানুযায়ী সে পুরস্কার বা শাস্তি গ্রহণ করে। কাজেই যারা একবার জন্মগ্রহণ করে, তাদের চিরবিনাশ কখনও হয় না। তারা হয়ত অস্তগামী সূর্য্যের রাজ্যে অবস্থান করে যেখানকার শাসনকর্তা হলেন যম। মানুষ মারা গেলে এই যমের রাজ্যে গমন করে। মৃত ব্যক্তি জল এবং সেতুর উপর দিয়ে ঐ রাজ্যে গমন করে।[৩] মানুষ মৃত্যুর পরে তার পূর্বপুরুষদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারে, বৈদিক আর্য্যদের এমন বিশ্বাসের কথাও বলা হয়েছে।[৪]

মানুষ মৃত্যুর পরে হয় ইহলোকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে বা পরলোকে গিয়ে সুখভোগ বা কষ্টভোগ করে—এই ধারণার মধ্য দিয়েই নৈতিক ধারণার প্রথম সূচনা। মানুষের সৎ বা মন্দ কাজের সঙ্গে তার সুখভোগ বা কষ্টভোগের এক

১। ১০।৫৮

২। শাঃ ব্রাঃ ১।৯।৩

৩। ১০।৬।১০ ; ৯।৪১।২

৪। ১।২৪।১ ; ৭।৫৬।২৪

অনিবার্য্য সম্পর্ক আছে। এক অলঙ্ঘ্য নিয়মের ধারণা (ঋতের মধ্য দিয়ে যার প্রকাশ ঘটেছে) এবং যজ্ঞ যে অবশ্যই তার কর্মফল উৎপন্ন করবে, এই নীতি-গুলিই পরবর্তীকালে কর্মবাদে এবং জন্মান্তরবাদে পরিণতি লাভ করেছে। প্রাক-ঔপনিষদিক বৈদিক সাহিত্যে মানুষের মধ্যে 'প্রাণবায়ু' (vital breath) বোঝাতে সর্বপ্রথম আত্মা শব্দটি ব্যবহৃত হয়। তারপর জগতের আত্মা (self of the world) এবং সর্বশেষে মানবাত্মা বোঝাতে আত্মা শব্দটি প্রযুক্ত হয়। [১]তৈত্তিরীয় আরণ্যকে বলা হয়েছে প্রজাপতি তাঁর আত্মা (জগৎ রূপে) সৃষ্টি করার পর, তাঁর নিজ আত্মা সহ তাতে প্রবেশ করলেন। তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে আত্মাকে সর্বব্যাপী বলা হয়েছে এবং একথাও বলা হয়েছে যে, যে আত্মাকে জানে সে কখনও কুকর্মের দ্বারা নিজেকে কলঙ্কিত করে না।

ঋগ্বেদে এক জায়গায় বলা হয়েছে,[২] তার যা করার তা সে সম্পূর্ণ করল, সে বৃদ্ধ হল, সেহেতু সে বিদায় নিল। কিন্তু তার পরেও সে আবার জন্মগ্রহণ করল, এটি তার তৃতীয় জন্ম। এই উক্তি ঐ বৈদিক মতবাদ স্মরণ করিয়ে দেয় যে প্রতি মানুষের তিনটে জন্ম আছে—শিশু রূপে প্রথম জন্ম, আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ করার পর সূচিত হয় দ্বিতীয় জন্ম এবং মৃত্যুর পরে হয় তার তৃতীয় জন্ম।

১০। ব্রহ্ম (Brahma) :

যে ব্রহ্মের ধারণা পরবর্তীকালে বেদান্ত দর্শনে সর্ব্বোচ্চ উৎকর্ষ লাভ করেছে, ঋগ্বেদে সেই ধারণার উদ্ভব এমন কথা ঠিক বলা চলে না। বেদের ভাষ্যকার সায়নাচার্য্য 'ব্রহ্ম' শব্দটির বিভিন্ন অর্থ করেছেন। এই অর্থগুলি হল—(১) খাদ্য, উৎসর্গীকৃত খাদ্য, (২) সুরে গীত সামগীত, (৩) ঐন্দ্রজালিক বিধি, (৪) যথাযথ সুসম্পূর্ণ অনুষ্ঠান, (৫) সুরে গীত সঙ্গীত এবং উৎসর্গীকৃত উপহার উভয়কেই একত্রে, (৬) হোতৃ পুরোহিতের আবৃত্তি, (৭) মহান্। রথ (*Roth*) বলেন যে ব্রহ্ম বলতে আরও বোঝায় সেই গভীর অনুরাগ যা আত্মার বাসনা এবং সন্তোষের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় এবং দেবতা পর্য্যন্ত পৌঁছায়। একমাত্র

১। ১।২৩ ২। ৪।২৭।১

শতপথব্রাহ্মণেই দেখা যায় ব্রহ্মের ধারণার এক গভীর তাৎপর্য্য রয়েছে। সেখানে ব্রহ্ম বলতে পরম নীতিকে বুঝিয়েছে, যে নীতি দেবতাদের অন্তরালে এক চলমান শক্তিরূপে ক্রিয়া করে। শতপথে বলা হয়েছে, সঠিকভাবে বলতে গেলে সুরুতে এই বিশ্বজগৎ ছিল ব্রহ্ম। ব্রহ্ম এই দেবতাদের সৃষ্টি করেছিল এবং দেবতাদের সৃষ্টি করার পর তিনি দেবতাদের এই জগতে অধিষ্ঠিত করেছিলেন এবং অগ্নিকে এই পার্থিব জগতে, বায়ুকে বাতাসে এবং সূর্য্যকে আকাশে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। তারপর ব্রহ্ম নিজেই এই জগতের অন্তরালে চলে গেলেন। অন্তরালে চলে যাবার পর তিনি চিন্তা করতে লাগলেন, কিভাবে আবার আমি এই জগতগুলিতে অধিষ্ঠিত হতে পারি। তারপর তিনি নাম ও রূপ —এই দুইয়ের মাধ্যমে এই জগতে আবার অধিষ্ঠিত হলেন। এই হল ব্রহ্মের দুটি মহান শক্তি এবং যিনি, ব্রহ্মের এই দুটি মহান শক্তিকে জানেন, নিজেও মহান শক্তিতে পরিণত হন। অন্য এক জায়গায় ব্রহ্মকে বিশ্বজগতের পরম বস্তু বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং প্রজাপতি, পুরুষ এবং প্রাণের (প্রাণ বায়ুর) সঙ্গে তাকে অভিন্ন গণ্য করা হয়েছে। অন্যত্র ব্রহ্মকে স্বয়ম্ভূ বলা হয়েছে যিনি জীবকে তাঁর আত্মা দান করেছেন এবং সকল জীবের উপর প্রাধান্য, সার্বভৌমত্ব এবং প্রভুত্ব অর্জন করেছেন।

ঋগ্বেদে সমস্ত বিশ্বজগৎ যে এক পরম সত্তায় বিধৃত সে কথাও বলা হয়েছে। ঋগ্‌বেদের পুরুষ সূক্তে এক পরম পুরুষের বর্ণনা পাওয়া যায় যিনি বিশ্বব্যাপী হয়েও বিশ্বকে অতিক্রম করে আছেন। নিখিল বিশ্ব তার এক চতুর্থাংশ মাত্র। তাঁর এক অংশে তিনি জীবজগতে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন। আর তিন চতুর্থাংশ অমৃতলোকে বিরাজমান। বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ সেই পুরুষের আত্মাস্বরূপ।

১১। নীতিতত্ত্ব (Ethics) :

ঋগ্বেদের নীতিতত্ত্বের আলোচনায় আমরা দেখতে পাই যে ঋতের ধারণা খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ। বৈদিক ঋষিগণ বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনার অন্তরালে এক সর্ব্বব্যাপী নিয়ম ও শৃঙ্খলার অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন। একেই বেদে ঋত নামে

অভিহিত করা হয়েছে। এই নিয়ম যেমন জীবজগতকে চালিত করে তেমনি ধর্ম ও নীতির সংরক্ষণে সহায়তা করে। ঋতের ধারণা সূচিত করে যে নৈতিক শৃঙ্খলা 'মহিমান্বিত এবং অলঙ্ঘ্য এবং এর কার্য্যকারিতা অমোঘ ও ন্যায়সঙ্গত।' পরবর্তীকালে এই ঋতের ধারণাই কর্মবাদে রূপ লাভ করেছে।

ঋতই নৈতিকতার মানদণ্ড সূচিত করে। ঋতই বস্তুর সার্বিক সারধর্ম। ঋতই হল সত্য ও শৃঙ্খলা। বিশৃঙ্খলা বা অনৃত-ই হল মিথ্যা; সত্যের বিপরীত।[১] যারা ঋতের অর্থাৎ সত্য ও শৃঙ্খলার পথ অনুসরণ করে তারাই সৎ। তারাই সত্যবাদী এবং নিয়মনিষ্ঠ। সৎজীবনের মূল বৈশিষ্ট্য হল সঙ্গতি, যারা ঋতের পথ অনুসরণ করে, ব্রতানি হল তাদের জীবনের আচরণ ধারা।[২] সৎ ব্যক্তি তার আচরণধারা বা জীবনধারা পরিবর্তন করে না। বরুণ একনিষ্ঠভাবে ঋতকে অনুসরণ করেন তাই তিনি হলেন ধৃতব্রত।

ঋগ্বেদের বিভিন্ন সূক্ত থেকে নৈতিক জীবনের বিশেষ বিশেষ উপাদানের কথা জানা যায়। দেবতাদের কাছে নিয়মিত ভাবে প্রার্থনা করতে হবে। যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে হবে।[৩] বেদ মানুষের সঙ্গে দেবতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা ব্যক্ত করে। ঈশ্বরের চোখের সামনেই মানুষকে তার জীবন চালিত করতে হবে। দেবতাদের প্রতি যেমন মানুষের কর্তব্য আছে তেমনি মানুষের প্রতিও কর্তব্য আছে।[৪] সকলের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা উচিত কর্ম। অতিথি-পরায়ণতা মহান পুণ্যের কাজ। যে ধন দান করে তার ধন হ্রাস পায় না। যে ব্যক্তি খাদ্যের অধিকারী হয়েও, পুষ্টির প্রয়োজন এমন ক্ষীণকায় ব্যক্তির প্রতি এবং দুঃখে পতিত কোন সাহায্যপ্রার্থীর প্রতি কঠোর হৃদয় হয় এবং তার সম্মুখেই নিজের ভোগ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে থাকে সেই ব্যক্তি কোন সান্ত্বনাদাতাকে খুঁজে পায় না।[৫] বেদে প্রতিবেশী এবং

১। ঋগ্বেদ, ৭।৫৬।১২

২। ৯।১২১।১ : ১০।৩৭।৫

৩। ১।১০৪।৬

৪। ১০।১১৭।৩

৫। ৮।৬।৫ ; ১।২।৬

বন্ধুর প্রতি মহানুভবতার প্রশংসা করা হয়েছে এবং ব্যয়কুণ্ঠতার নিন্দা করা হয়েছে। ঋগ্বেদে বলা হয়েছে 'কেবলাঘো ভবতি কেবলাদী' অর্থাৎ যে শুধু নিজেই আহার করে নিজের কাছেই পাপকে রেখে দেয়।[১] মন্দ অভিপ্রায়, শপথ ক্রিয়া, মিথ্যাবাদিতা, ষড়যন্ত্র, নিন্দাবাদ, পরচর্চ্চা, অসাধুতা, স্বার্থপরতা ডাকিনীবিদ্যা, ইন্দ্রজাল, ব্যভিচার প্রভৃতি পাপজনক কার্য্যরূপে গণ্য।[২] দ্যূত-ক্রীড়া নিন্দাজনক কার্য্য। ঈশ্বরের নিয়মের সঙ্গে সঙ্গতিই হল সদাচার। মানুষের প্রতি ভালবাসা সদাচারের অন্তর্ভুক্ত। ঐশ্বরিক নিয়ম লঙ্ঘন হল পাপাচার। সততা, সরলতা, সহানুভূতি, অহিংসা, সত্যবাদিতা; হিত ও মনোহর বাক্য, সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য, সশ্রদ্ধবিশ্বাস উচ্চপ্রশংসিত পুণ্য কার্য্য।[৩]

ঋগ্বেদে কৃচ্ছসাধনকে পুণ্য কার্য্য বলে গণ্য করা হয়েছে। কথিত আছে ইন্দ্র কৃচ্ছসাধনের দ্বারাই স্বর্গ জয় করেছেন। কিন্তু অনেকের মতে ঋগ্বেদে যে চিন্তাধারার প্রাধান্য তা কৃচ্ছসাধনের নয়। ঋগ্বেদের মন্ত্রে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে আনন্দানুভূতির, প্রকৃতির মহত্ত্বের ও মহিমার কথা ব্যক্ত হয়েছে। যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হল জগতের সৎ বস্তুগুলির প্রতি অনুরাগ। জীবনের মধ্যে নিহিত রয়েছে গভীর আনন্দ। বিষাদের অন্ধকারে এই বিশ্বজগৎ সমাচ্ছন্ন নয়।

বেদে বলা হয়েছে এক যজ্ঞের তিনবার অনুষ্ঠান, অবৈধ ভোজন এবং যথেচ্ছ দান গ্রহণ দুঃখের কারণ।[৪] পাপীর সংসর্গ অশুচিতার কারণ।[৫] বোধশক্তির[৬] অভাবহেতু কোন ব্যক্তি পাপকার্য্য সম্পাদন করলে বা সে দোষ স্বীকার করলে[৭]

১। ১০।১১৭।৬

২। ঋঃ সঃ ১।২৩।২২, ৪।৫।৫, ৭।১০৪।১—২৫ ;
অথ ৬।১১২।৩, বাঃ স ৩০।৫।১৩, মৈঃ সঃ ৪।১৪৬।১৭ ; তৈঃ ব্রাঃ ৩।৭।১২

৩। ঋ সঃ ১০।১১৭।১৫৪ ; অথ ১১।৫

৪। তৈঃ সঃ ১।১।১৩।৩

৫। অথ ৭।৬৫।৩

৬। ঋঃ সঃ ৭।৮-৬।৬ ; শাঃ ব্রাঃ ৪।৪।৫।২৩

৭। শাঃ ব্রাঃ ২।৫।২।২০

তার দুষ্কর্মের হেয়ত্ব কিছুটা হ্রাস হতে পারে কিন্তু অজ্ঞানকৃত, আকস্মিক বা অনিবার্য্য পাপকার্য্যের জন্য প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন আছে।[১]

এক পরিবারভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও অন্তরঙ্গতা, পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্যের মনোভাব, হিত ও মনোহারী বাক্য, দায়িত্ববোধ প্রভৃতি গুণগুলি অর্জন করতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। নারীর স্বীয় পতি নির্বাচনের এবং পুনর্বিবাহের অধিকারের কথা বলা হয়েছে।[২] পুরুষদের বহুবিবাহ অনুমোদিত হলেও, নারীর বহু পতি গ্রহণের পক্ষে কোন অনুমোদন ছিল না।[৩]

হিন্দু সমাজের চতুর্বর্ণের কথা ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্তেই প্রথম জানা যায়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শ্রেণী দ্বারা গঠিত সমাজ, শূদ্র শ্রেণীকে তার অন্তর্ভুক্ত করল। শূদ্রেরা এতদিন দাস বলেই পরিচিত ছিল।[৪] প্রথম তিন শ্রেণীই কেবলমাত্র আর্য্য নামে অভিহিত হত। এই যুগেই চতুরাশ্রমের সৃষ্টি। এই সব চতুরাশ্রমকে আধ্যাত্মিক উন্নতির সোপান মনে করা হত। অথর্ববেদে শ্রমবিমুখ ব্যক্তির সমৃদ্ধিলাভের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা হয়েছে।[৫] প্রত্যেক ব্যক্তি সমাজে পাঁচটি ঋণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, ঋষি, দেবতা, পিতৃপুরুষ, নর ও পশু। এই ঋণ-যথাক্রমে বেদপাঠ, যজ্ঞ, সন্তানোৎপাদন, অতিথিসৎকার ও আহার্য্যের দ্বারা পরিশোধ করতে হয়—এই পাঁচটি পঞ্চ মহাযজ্ঞ নামে গণ্য।[৬]

সৎ কার্য্যের চরম লক্ষ্যকে কখনও সমৃদ্ধি, কখনও স্বর্গ, কখনও বা অমৃতত্ব রূপে গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু মানুষের বিবেকানুমোদিত ও প্রজ্ঞাসম্মত সৎ কার্য্যের নিজস্ব মূল্য আছে এমন স্বীকৃতিও দেখা যায়।[৭] সৎকর্ম সম্পাদনের

১। তৈঃ ব্রাঃ ২।৭।১২।১-৪

২। ঋঃ সঃ ১০।২৭।১২, তৈঃ ব্রাঃ ২।১।২।২০ অথ ৯।১২৭-৮।

৩। তৈঃ সঃ ৬।৫।১।৪, শাঃ ব্রাঃ ৯।৪।১।৬,

৪। অথ ৪।২০।৪-৮, ৫।২২।৭, তৈঃ সঃ ৭।২।৬।২

৫। অথ ৭।১৫

৬। তৈঃ সঃ ৬।৩।১০।৫, শতঃ ব্রাঃ ১।৭।২।১-৫ ; ১১।৫।৬।১

৭। ঋঃ সঃ ১।১৮৯।১, ৮।৯৭।১৩, ১০।১৪৫।৪, ১০।৩১।২, অথ ১১।৪।১১ , ১১ ৫।১৯

পুরস্কার হল দেবতাদের সাহচর্যে স্বর্গসুখভোগ। পাপ ও অসদাচারের ফল অনন্ত নরকভোগ। ঋগ্বেদে নরকের প্রসঙ্গ খুব সুস্পষ্ট নয় কিন্তু অথর্ববেদে ও ব্রাহ্মণে নরকের কথা বলা হয়েছে। নরকের বর্ণনায় বলা হয়েছে এটি অনন্ত অন্ধকারের স্থান, স্বর্গ হল আলোকের স্থান। যারা একবার নরকে যায় তারা সেখান থেকে পালিয়ে আসতে পারে না।

১২। উপসংহার (Conclusion):

ঋগ্বেদের চিন্তাধারায় বিকাশ লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে জগতকে যেমন কতকগুলি অংশের পরস্পর সম্পর্কযুক্ত সমষ্টি বলা হয়েছে তেমনি বলা হয়েছে যে জগৎ এক মহান পুরুষ থেকে উদ্ভূত। তাঁকে সময় সময় জগতের সঙ্গে সমব্যাপক মনে করা হয়েছে, আবার সময় সময় তিনি জগতকে অতিক্রম করে আছেন, বা জগত থেকে স্বতন্ত্র এ কথাও বলা হয়েছে। সময় সময় দেখা যায় যে এক অজ্ঞাতবাদী মনোভাব খুব সুস্পষ্ট রূপে মৌলিক প্রশ্ন সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছে, 'কে জানে এই জগৎ কখনও সৃষ্টি হয়েছিল কি হয়নি, কে জানে?' দ্বিতীয়তঃ, যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানের প্রসার সেই অলঙ্ঘনীয় নিয়ম প্রতিষ্ঠার সহায়ক হল যে নিয়মানুসারে যাগযজ্ঞ নিজ থেকেই তার ফল উৎপন্ন করত। প্রকৃতপক্ষে এই বিষয়টি জগতের এবং আমাদের অদৃষ্টের সর্বপ্রধান প্রভু হিসেবে দেবতাদের গুরুত্ব অনেকখানি খর্ব করেছে। একাতিদেববাদ (Henotheism)-ও দেবতাদের বহুত্বের হ্রাস করে একেশ্বরবাদী বৈশিষ্ট্যের সূচনা করেছে। তৃতীয়তঃ, মানুষের আত্মাকে যে দেহ থেকে পৃথক করা যায় এবং সৎ ও মন্দ কার্য্য অনুসারে অন্য এক জগতে মানুষকে যে তার কর্মফলভোগ করতে হয় এ কথা বলা হয়েছে। মানুষের আত্মা যে উদ্ভিদের কাছে যেতে পারে বা ঐ আত্মা পৃথিবীতে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে পারে, এ কথা কোথাও কোথাও বলা হয়েছে এবং এই অভিমতই যে পরবর্তী কালের জন্মান্তরবাদের সূচনা করেছে এ কথা বলা যেতে পারে। আত্মাকে একজায়গায় জগতের সারবস্তুরূপে বলা হয়েছে এবং ব্রাহ্মণে ও আরণ্যকে যখন আমরা এই ধারণাকে অনুসরণ করি তখন দেখি আত্মা মানুষ ও জগতের সারবস্তুরূপে গণ্য হয়েছে এবং উপনিষদের আত্মা সম্পর্কীয় মতবাদের সূচনা করেছে।

ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি পরবর্তী ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছে। ব্রাহ্মণে মন্ত্রের যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানের দিকটি আলোচিত হয়েছে, উপনিষদে তাদের দার্শনিক তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাত হয়েছে। বেদের 'ঋত' সম্পর্কীয় মতবাদের মধ্যে কর্মবাদের বীজ প্রচ্ছন্নভাবে বর্তমান।

ডঃ রাধাকৃষ্ণণের মতে হিরণ্যগর্ভের জলের উপরে ভাসমান হওয়ার ধারণাটি থেকেই সাংখ্যের দ্বৈতবাদী তত্ত্বের যৌক্তিক বিকাশ ঘটেছে। যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠিত বা মন্ত্র গীত হলে বা সোমরস পানের ফলে যে উল্লাসের অবস্থার সৃষ্টি হয় তার বর্ণনা আমাদের যোগজ ঐশ্বরিক প্রশান্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

Questions.

1. "The Vedas give us abundant information, respecting all that is more interesting in the contemplation of antiquity"— Discuss.

2. How do the Eastern and Western scholars interpret the Vedas ? Which of them do you consider to be satisfactory and why ?

3. 'Three strata of thought can be discovered in the religion of the hymns of the Rg-Veda, which are nationalistic polytheism, monotheism and monism'—Discuss.

4. 'Polytheism, henotheism and monotheism are three different stages in the evolutionary history of the Vedic gods. Give a brief account of these three stages and show how monotheism culminates in monism.

5. Describe the Vedic conception of the Universe.

6. Describe the theory of Rita. How did it bring a change in the conception of the gods ?

7. Give an account of the ethics of the Rg.-Veda.

8. Give a brief description of the general outlook on life and things in the Vedic period.

9. 'The hymns form the foundation of subsequent Indian thought.'—Discuss

10. Explain the place of the Vedas in Indian philosophy, and clasify the systems of philosophy accordingly.

(C. U. Hons. 1962)

বেদের দর্শনের আলোচনায় নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

1. *S. Radhakrisnan*—Indian Philosoply Vol-I.
2. *Dr. J. N. Sinha*—History of Indian Philosophy. Vol-I.
3. *M. Hiriyana*—Outlines of Indian Philosophy.
4. *Macdonell*—Vedic Mythology.
5. *Max Muller*—History of Ancient Sanskrit Literatures.
6. *Bloomfied*—Religion of the Veda,
7. *Kaegi*—The Rig-Veda.
8. Deussen—Outlines of Indian Philosophy.
9. অনির্বান—বেদ-মীমাংসা (প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড)।
10. স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত—ঋগ্বেদ
11. ঐ —সামবেদ
12. ঐ —যজুর্বেদ
13. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস—প্রথম খণ্ড : প্রথম ভাগ (ভারত সরকারের শিক্ষাধিকারিক বিভাগের উদ্যোগে লিখিত ও প্রকাশিত)।

দ্বিতীয় অধ্যায়

উপনিষদের দর্শন

(The philosophy of the Upanisads)

১। ভূমিকা (Introduction):

উপনিষদকে ভারতীয় চিন্তাধারা ও সংস্কৃতির মূল উৎসরূপে গণ্য করা যেতে পারে। উপনিষদ বেদের সর্বশেষ অংশ। সে কারণে উপনিষদকে বেদান্ত বলে। মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ নিয়ে বেদ। ব্রাহ্মণের শেষ পর্ব যেমন আরণ্যক, তেমনি আরণ্যকের শেষ পর্ব উপনিষদ। পরবর্তীকালের বহু ভারতীয় দর্শন ও ধর্মের ভিত্তি হল উপনিষদ। উপনিষদগুলিকে বেদতত্ত্বের ভাষ্য বলা যেতে পারে। সাংখ্য, ন্যায়, বৈশেষিক, প্রভৃতি আস্তিক দর্শনগুলিই যে উপনিষদের দ্বারা অনুপ্রানিত হয়েছে তা নয়, বৌদ্ধদর্শনের মত কয়েকটি নাস্তিক দর্শনও উপনিষদ থেকে অনুপ্রেরনা লাভ করেছে বলা যেতে পারে। উপনিষদগুলি কোন সুসংবদ্ধ দর্শনগ্রন্থ নয়, কোন একজন মাত্র রচয়িতার রচনা নয়; সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের উপলব্ধ আধ্যাত্মিক সত্যই উপনিষদে লিপিবদ্ধ হয়েছে। কাহিনী, হিতোপদেশ, কথোপকথন ও ঘরোয়া আলোচনার মাধ্যমে এই সব সত্যদ্রষ্টা তাঁদের উপলব্ধ সত্যগুলিকে প্রকাশ করেছেন। উপনিষদের ভাষা প্রায়ই সরল সংস্কৃত হলেও এর অর্থ সকল সময় সুখবোধ্য নয়। অনেক জায়গায় এর অর্থ পরিস্ফুট না হয়ে প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। আবার অনেক সময় কোন কোন অংশ খুব রহস্যময় মনে হয়। কিন্তু অনেকে মনে করেন যে এর ফলে উপনিষদের আকর্ষণ বর্ধিত হয়েছে।

উপনিষদ
বেদের সর্বশেষ অংশ

সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের
উপলব্ধ আধ্যাত্মিক সত্য

উপনিষদের রচনাবলীতে যেমন তত্ত্ববিদ্যা আছে, তেমনি তার কাব্যগুণও তার এক পরম সম্পদ। বস্তুতঃ এই কাব্যগুণসম্পন্ন দার্শনিক রচনাবলী তার

প্রসাদগুণের জন্য আজও আকর্ষণীয়। তত্ত্বজিজ্ঞাসু মনের সামনে যেমন তারা উপস্থাপিত করে দার্শনিক মতবাদ, তেমনি মনের অন্তরে নিয়ে আসে শান্তি ও স্বাধীনতা। রাধাকৃষ্ণণ বলেন, "উপনিষদের লক্ষ্য যতটা না দার্শনিক সত্যে উপনীত হওয়া তার তুলনায় উদ্বেগাকুল মানবাত্মায় শান্তি ও স্বাধীনতা নিয়ে আসা।" জ্ঞানের জন্য তীব্র আকাঙ্খা, সত্যোপলব্ধির জন্য অস্থির প্রচেষ্টা এবং তত্ত্বানুসন্ধানের জন্য নিরলস অনুসন্ধানের ইচ্ছা উপনিষদের রচনাবলীর মধ্য দিয়ে প্রকাশ লাভ করেছে। উপনিষদের মধ্যে এমন মৌলিক ধারনার আলোচনা আছে যা গভীর তাৎপর্য্য-সূচক এবং তৃপ্তিকর। যদিও একাধিক ব্যক্তির রচনা এবং রচনাগুলি অর্দ্ধ-কাব্য, অর্দ্ধ-দর্শন, তবু তাদের মধ্যে একটা লক্ষ্যের ঐক্য বর্তমান। স্বজ্ঞামূলক (intuition) বা অপরোক্ষ অনুভূতিমূলক দর্শনরূপে উপনিষদ অতুলনীয়। প্রাক্-ঔপনিষদিক-চিন্তাধারার মধ্যে এমন কোন চিন্তাধারার সন্ধান পাওয়া যায় না, ব্যাপকতা, তাৎপর্য ও পরিতৃপ্তির দিক থেকে উপনিষদের চিন্তাধারার সঙ্গে যার তুলনা চলতে পারে। উপনিষদের রচনা মানুষকে দিয়েছে জীবনে সত্যের ইঙ্গিত। রাধাকৃষ্ণণের ভাষায় "এ্যারিষ্টটল, কাণ্ট বা শংকরের সুসংহত দার্শনিক চিন্তার মতন উপনিষদে কোন দার্শনিক সমন্বয় লক্ষ্য করা যায় না। যুক্তির সংগতির তুলনায় স্বজ্ঞা বা অপরোক্ষ অনুভূতির সংগতি তার আছে এবং এমন কতকগুলি মৌলিক ধারণা আছে, যার থেকে একটা সুসমন্বিত ও সুসংগত দার্শনিক মতবাদের বিকাশ সম্ভব।"

কাব্যগুণ

স্বজ্ঞামূলক দর্শনরূপে উপনিষদ অতুলনীয়

রাধাকৃষ্ণণের মন্তব্য

উপনিষদের দার্শনিক চিন্তাধারা বিশ্বের বহু মনীষীকে অনুপ্রাণিত করেছে। ডসেন (*Deussen*) মনে করেন যে উপনিষদের মধ্যে এমন দার্শনিক ধারণা আছে, শুধু ভারতে কেন, সমস্ত জগতে তার তুলনা মেলা ভার। অধ্যাপক উইনটারনিজ (*Winternitz*) বলেন, "এই সব প্রাচীন চিন্তাবিদ্‌রা সত্যকে জানার জন্য কি প্রবল প্রচেষ্টা না করছেন এবং তাদের দার্শনিক কবিতায় জ্ঞানের জন্য মানুষের অনন্ত অতৃপ্ত আকাঙ্খা এত ঐকান্তিক আগ্রহের সঙ্গে প্রকাশলাভ করেছে যে রচনাগুলি

বিভিন্ন মনীষীর মন্তব্য

মানবজাতির পক্ষে অমূল্য সম্পদ। তাদের মধ্যে অনেকগুলি প্লেটোর কথোপকথনের সমতুল্য। তাদের দ্বারা অনুপ্রানিত হয়ে বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক সোপেমহাওয়ার (*Schopenhaur*) বলেছিলেন, "সমস্ত পৃথিবীতে এমন হিতকারী, এমন উৎকর্ষসাধক গ্রন্থ আর নেই। এটি আমাকে জীবনে দিয়েছিল তৃপ্তি, মরণেও এনে দেবে তৃপ্তি।" উপনিষদের চিন্তাধারা দার্শনিক শেলিং (*Shelling*)-কেও বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। বিখ্যাত ভারতীয় শাস্ত্রবিৎ ম্যাকস্‌মূলার শেলিং-এর কাছে উপনিষদের প্রশংসা শুনে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি বিশেষভাবে অকৃষ্ট হন। পরবর্তীকালে তিনি প্রাচীন উপনিষদগুলিকে ইংরাজীতে অনুবাদ করেন এবং ইংরাজী ভাষাভাষী ব্যক্তিদের ঔপনিষদিক চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ করে দেন।

২। উপনিষদের শিক্ষা (The Teaching of the Upanisads):

উপনিষদের শিক্ষা কি, নিরূপণ করা অত সহজ নয়। অনেকেই উপনিষদ পাঠ করার সময় কোন পূর্বপরিকল্পিত মতবাদের আলোকে তা পাঠ করে থাকেন। মানুষ নিজের বিচারের উপরে নির্ভর করতে পারে না বলেই অনেক সময় কোন মতবাদকে প্রামাণ্য মনে করে তার উপরে নির্ভর করতে চায়। কিন্তু সত্য উপলব্ধির জন্য বিচারের যেমন প্রয়োজন, অন্তর্দৃষ্টিরও তেমনি প্রয়োজন আছে। শঙ্করাচার্য্য উপনিষদ, ভগবদ্গীতা ও বেদান্ত সূত্রের উপর ভাষ্য রচনা করে তাঁর কেবলাদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু রামানুজ মনে করেন যে উপনিষদের শিক্ষাকে শঙ্করাচার্য্য যথাযথভাবে উপস্থাপিত করতে পারেন নি। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিই যে জীবের মুক্তির হেতু, এই হল তাঁর মতে উপনিষদের শিক্ষার পরিণাম। বিভিন্ন ভাষ্যকার উপনিষদের বিভিন্ন ভাষ্য রচনা করেছেন এবং নিজেদের মতবাদগুলিকে জোর করে উপনিষদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করে দিয়েছেন।

উপনিষদের শিক্ষা সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত

প্রচলিত ধারণা অনুসারে প্রত্যাদিষ্ট সত্যরূপে উপনিষদগুলি একই মতবাদ

প্রচার করেছে। কিন্তু উপনিষদগুলির ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে নানারকম পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যে সমস্যাগুলি উপনিষদে আলোচিত হয়েছে এবং যে ভাবে সেগুলি আলোচিত হয়েছে, সে কারণেই তাদের নানা রকম ব্যাখ্যা সম্ভব হয়েছে। উপনিষদের সব শিক্ষাই যে সমান লক্ষ্যণীয় তা নয়। কতকগুলি নিছক আকস্মিক চিন্তা ও কতকগুলি শুধু ইঙ্গিত মাত্র, কিছু কিছু বিস্তৃত বর্ণনাসমন্বিত, কিছু কিছুর শুধুমাত্র উল্লেখ করা হয়েছে এবং কিছু কিছু পুনরাবৃত্তি সহকারে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত। তাদের মধ্যে একটা উদ্দেশ্যগত ঐক্য (unity of purpose) পরিদৃষ্ট হয়।

উপনিষদের বিভিন্ন ব্যাখ্যা

তারা একই মৌলিক মতবাদ উপস্থাপনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে, যাকে 'অদ্বৈতবাদী ভাববাদ' (monistic idealism) বা 'ভাববাদী অদ্বৈতবাদ' (idealistic monism) নামে অভিহিত করা হয়।

সংহিতার বিক্ষিপ্ত অদ্বৈতবাদী ধারণাগুলিকে উপনিষদ সম্প্রসারিত করেছে। ব্রাহ্মণ যুগে এই বিক্ষিপ্ত দার্শনিক ধারণাগুলিকে উপেক্ষা করা হয় এবং যাগ-যজ্ঞ অনুষ্ঠানের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ব্রাহ্মণের শেষপর্ব আরণ্যক, আরণ্যকের শেষপর্ব উপনিষদ্। আরণ্যকে যাগযজ্ঞের তুলনায় দার্শনিক চিন্তাধারার উপর গুরুত্ব অরোপ করা হয়েছে, এবং উপনিষদে তারই পরিপূর্ণতা। 'ব্রাহ্মণে দ্রব্যযজ্ঞের বিধান, আরণ্যকে তারই সূক্ষ্ম ভাবনা, উপনিষদে তত্ত্বজ্ঞান।' উপনিষদগুলির অন্তর্নিহিত ভাব স্বভাবতঃই যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানের বিরোধী। বৃহদারণ্যকে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি আত্মা ভিন্ন অন্য কোন দেবতাকে উপাসনা করেন, তিনি অবিদ্যাবান ; দেবগণের নিকট তিনি পশুর সদৃশ।[1] ছান্দোগ্য উপনিষদে যজ্ঞ সম্পাদনকারী পুরোহিতদের বিদ্রূপ করে বলা হয়েছে যে পুরোহিতদের মতন একদল কুকুর যেন সারিবদ্ধ হয়ে হিংকার উচ্চারণ করছে। হিংকারটি এই "ওম্ ভোজন করব, ওম্ গান করব, ওম্ জ্যোতির্ময়, বর্ষণকারী,

তত্ত্বজ্ঞান উপনিষদের লক্ষ্য

1. বৃহঃ ১।৪।১০

প্রজাগণের পতি, জগৎ প্রসবিতা সূর্য্য। এই স্থানে অন্ন আহরণ করুন। এই হিংকার করে তারা সূর্য্যকে প্রার্থনা করলেন।”[1] মুণ্ডকোপনিষদে বলা হয়েছে যে দুরকম বিদ্যা আছে—পরা ও অপরা। তন্মধ্যে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ—এই সব অপরা বিদ্যা কিন্তু পরা বিদ্যা হল সেই বিদ্যা যে বিদ্যার দ্বারা সেই অক্ষরকে (অর্থাৎ ব্রহ্মকে) প্রাপ্ত বা জ্ঞাত হওয়া যায়।[2] মুণ্ডকোপনিষদে যাগযজ্ঞের উপর সর্বাপেক্ষা তীব্র আক্রমণ চালান হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে জ্ঞানরহিত ক্রিয়াকলাপকে যে মূর্খগণ শ্রেয়োলাভের উপায় বলে সমাদর করে তারা পুনরায় জরামৃত্যুর কবলিত হয়।[3] কর্মকাণ্ডের স্থান নিকৃষ্ট প্রতিপন্ন করার জন্য উপনিষদগুলিতে বলা হয়েছে যে কর্মের দ্বারা কেবল পিতৃলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। পিতৃলোক মানুষের অস্থায়ী বাসভূমি, যেখান থেকে প্রত্যেককেই জন্মমৃত্যু ভোগ করার জন্য পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করতে হয়।[4]

ভিন্ন ভিন্ন উপনিষদের ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য

উপনিষদের প্রধান মতবাদ, ভাববাদী অদ্বৈতবাদের উদ্ভবের জন্য ঋগ্বেদের যে সব সূক্তে অদ্বৈতবাদী চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে সেগুলির দিকে দৃষ্টি দেওয়া যুক্তিসঙ্গত।

ভাববাদী অদ্বৈতবাদ

৩। উপনিষদের অর্থ (Meaning of the word Upanisad) :

উপনিষদের অর্থ নিয়ে এ যুগে অনেক তর্ক বিতর্ক হয়েছে। উপ-নি-সদ্ ধাতু ক্বিপ্ প্রত্যয় করে উপনিষদ্ শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। 'উপ' এই উপসর্গটির দ্বারা সমীপবর্তিতা বোঝায়। সদ্ অর্থে বসা, এবং সদ্ অর্থে প্রাপ্তি বা বিনাশও বোঝায়। কাজেই এই থেকে অনেকে সিদ্ধান্ত করেছেন যে গুরুর কাছে উপবিষ্ট হয়ে শিষ্য যে জ্ঞান লাভ করত তার নাম উপনিষদ। বিখ্যাত ভারতীয় শাস্ত্রবিৎ ম্যাক্সমূলার উপনিষদের এই অর্থ ই সমর্থন করেছেন। তিনি বলেছেন, 'প্রথম উপনিষদ বোঝাত একটি সভা, বিশেষ করে এমন সভা

গুরুর কাছে উপবিষ্ট হয়ে যে জ্ঞান লাভ করা হয়

1. ছান্দো ১।১২।৪-৫ 2. মুণ্ডকো ১।১।৪-৫ 3. মুণ্ডকোপনিষৎ ১।২।৭ 4. বৃহঃ ১।৫।১৬;

বোঝাত যেখানে গুরুর কাছ থেকে একটু ব্যবধান রক্ষা করে তাঁর শিষ্যরা তাঁকে ঘিরে সমবেত হত[1]।" কিন্তু গুরুর কাছে গিয়ে জ্ঞান আহরণের কথা উপনিষদের বহু জায়গায় থাকলেও, বসা অর্থে সদ্-এর ব্যবহার প্রাচীন উপনিষদগুলির কোথাও দেখা যায় না। সব জ্ঞানই শিষ্য গুরুর সমীপে উপবিষ্ট হয়ে গ্রহণ করত। সুতরাং সে অর্থে সব বিদ্যাকেই উপনিষদ বলা যেতে পারে। 'উপ' এই উপসর্গে সমীপবর্তিতা বোঝায়, কাজেই যা মানুষকে ব্রহ্মের সমীপবর্তী করে তাকে উপনিষদ্ বলা হয়। শঙ্করাচার্য্য উপনিষদের অর্থ করেছেন 'যা অবিদ্যা নাশ করে[1]।' পল ডসেন (*Paul Deussen*)-এর মতে উপনিষদের অর্থ রহস্যগত জ্ঞান। রাধাকৃষ্ণণের মতে উপনিষদের অর্থ হল যা ভ্রান্তির বিনাশ সাধন করে এবং মানুষকে সত্য উপলব্ধিতে সমর্থ করে। অষ্টোত্তরশত উপনিষদের সঙ্কলনে পণ্ডিত বাসুদেব শর্মা উপনিষদের যে অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন তা হল গুরুর কাছ থেকে পাওয়া সুনিশ্চিত জ্ঞান যা জন্ম মৃত্যুর বন্ধনকে খণ্ডন করে। উপ অর্থে গুরুর কাছ থেকে পাওয়া, নি অর্থে সুনিশ্চিত জ্ঞান আর সদ্ অর্থে যা জন্ম মৃত্যুর বন্ধনকে খণ্ডন করে। [2]অনির্বাণ তাঁর 'বেদ-মীমাংসায় বলেন, "সবদিক বিচার করে এই সিদ্ধান্তই হয়। উপনিষদের যা বুৎপত্তিগত অর্থ, তার উদ্দিষ্ট মানুষ নয়—দেবতা। দেবতা এসে আচার্য্যের হৃদয় নিষন্ন হলে তাঁর মাঝে যে তত্ত্বজ্ঞানের স্ফূরণ হয়, তাই 'উপনিষদ'। এই অর্থই স্বাভাবিক এবং পরম্পরাগত। আচার্য্যের কাছে বসে বিদ্যাগ্রহণ অর্থটা গৌণ এবং আনুষঙ্গিক মাত্র। বেদের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য উপনিষদেই প্রকাশিত। সে কারণে উপনিষদকে বেদোপনিষদ নামে অভিহিত করা হয়। উপরিউক্ত বিভিন্ন ব্যাখ্যা উপনিষদের[3] কতকগুলি বিশেষ দিকের উপর আলোকপাত করে।

যা মানুষকে ব্রহ্মের সমীপবর্তী করে

উপনিষদের অর্থ সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষীর মন্তব্য

1. *Maxmuller*, Sacred Books of the East Vol. I P. lXXYI

2. অনির্বাণ : বেদ-মীমাংসা

আবার কোন[1] লেখক মনে করেন উপনিষদের গূঢ় অর্থ আবিষ্কারের প্রচেষ্টাই তার অর্থকে জটিল করে তুলেছে। তাঁর মতে 'বেদের শেষে তার অবস্থিতি বলেই তার নাম উপনিষদ, অন্য কোন কারণে নয়।' 'বেদের প্রান্তে বেদকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল বলেই তাকে উপনিষদ বলা হয়।' উপনিষদের অর্থ উপরিউক্ত সব ব্যাখ্যা এবং তারও অধিক কিছু।

৪। উপনিষদের সংখ্যা এবং রচনাকাল (Number and Date of the Upanisad) :

আজ পর্যন্ত অনেকগুলি উপনিষদ পাওয়া গেছে। উপনিষদ সংখ্যায় অনেক। মুক্তিকোপনিষদে ১০৮ খানি উপনিষদের নাম উল্লেখ আছে। বর্তমানে ১১২ খানি উপনিষদের নাম জানা গেছে। এগুলির মধ্যে বৃহদারণ্যক, শ্বেতাশ্বতরো, ছান্দোগ্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, কৌষীতকি, ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক এবং মাণ্ডুক্য এই কখানা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই বারখানি উপনিষদ প্রাচীন বলে স্বীকৃত। এর স্বপক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে বলা হয় যে প্রাচীন উপনিষদগুলির বেশীর ভাগ বৈদিক সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার সঙ্গে সংযুক্ত, কোনটি বা সংহিতা অংশের সঙ্গে, কোনটি বা ব্রাহ্মণের সঙ্গে, কোনটি বা আরণ্যকের সঙ্গে। যেমন—ঈশ উপনিষদ শুক্ল যজুর্বেদের বাজসনেয় সংহিতার অংশ; বৃহদারণ্যক শুক্ল যজুর্বেদের শতপথব্রাহ্মণের অংশ; ছান্দোগ্য সামবেদের ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের অংশ; ঐতরেয় ঋগ্‌বেদের ঐতরেয় আরণ্যকের অংশ। শংকরাচার্য কৌষীতকি উপনিষদ ছাড়া উপরিউক্ত বাকি এগারটি উপনিষদের উপর ভাষ্য রচনা করেছেন।

উপনিষদের সংখ্যা ১১২ খানা

উপনিষদের যথার্থ রচনাকাল এবং কোনটির পরে কোনটি রচিত হয়েছে নিরূপণ করা খুবই কঠিন। এমন কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই যার সাহায্যে এই সমস্যাটির মীমাংসা করা যেতে পারে। একটা প্রচলিত মতানুসারে সংহিতা, ব্রাহ্মণ এবং আরণ্যকের মতনই উপনিষদও বেদের অংশ, কাজেই

---

1. হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, উপনিষদের দর্শন পৃঃ ১২

অন্য তিনটির মতন উপনিষদও প্রাচীন। কোন কোন পাশ্চাত্ত্য লেখক বেদের সাহায্যে উপনিষদের রচনার তারিখ নিরূপণের চেষ্ট করেছেন। তাঁদের মতে যে উপনিষদগুলি সবচেয়ে প্রাচীন সেগুলি বুদ্ধপূর্ব এবং কতকগুলি বুদ্ধপরবর্তী। প্রাচীন উপনিষদগুলির রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ থেকে ৩০০-এর মধ্যে। পরবর্তীকালের যে সব উপনিষদ, যেগুলির উপর শংকরাচার্য্য তাঁর ভাষ্য রচনা করেছেন, সেগুলি বুদ্ধ-পরবর্তী এবং খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০ বা ৩০০-এর মধ্যে। প্রাচীন উপনিষদগুলি গদ্যে রচিত। ঐতরেয়, কৌষীতকি, তৈত্তিরীয়, বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য এবং কোনোপনিষদের কিছু অংশ প্রাচীন। ভাষা ও বাগ্‌ভঙ্গীর বিচারে এই ছয়খানিকেই সর্বপ্রাচীন বলে গণ্য করা হয়। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, এই উপনিষদগুলি সবই বুদ্ধপূর্ব যুগের।

বেদের সাহায্যে উপনিষদের রচনার তারিখ নিরূপণ

কোন কোন উপনিষদ-বুদ্ধ-পূর্ব যুগের

কারও কারও মতে গীতাতে উপনিষদের সারবস্তু সংরক্ষিত। গীতা মহাভারতের অংশ। কাজেই কোন কোন উপনিষদ মহাভারতের পূর্বে অর্থাৎ খ্রীষ্টের জন্মের তিন হাজার বৎসর পূর্বে অবশ্য রচিত হয়েছে। কাজেই উপনিষদের রচনাকাল খ্রীষ্টের জন্মের পূর্বে ৬০০ বছর থেকে ৩০০০ বছর। হাজার বছর ধরে গুরু পরম্পরায় উপনিষদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে মুখে মুখে। কিন্তু তাদের রচনাকাল যে খ্রীষ্টের জন্মের ৬০০ শত বৎসর পূর্ব থেকে তা অস্বীকার করা যায় না।

কোন কোন উপনিষদ মহাভারতের পূর্বে রচিত

খ্রীষ্টের জন্মের ৬০০ শত বৎসর পূর্বে

কঠোপনিষদ অনেক পরবর্তী কালের রচনা কেননা সাংখ্য ও যোগ দর্শনের অনেক উপাদান কঠোপনিষদে পাওয়া যায়। ভগবদ্গীতা এবং অন্যান্য উপনিষদ থেকে অনেক উদ্ধৃতি কঠোপনিষদে লক্ষ্য করা যায়। অথর্ববেদের উপনিষদগুলিও পরবর্তীকালের রচনা। মৈত্রায়ণী উপনিষদেও সাংখ্য ও যোগ দর্শনের উপাদান পাওয়া যায়। শ্বেতাশ্বতরো উপনিষদ এমন সময় রচিত হয় যখন বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদগুলি প্রচারিত হচ্ছে। [1]রাধাকৃষ্ণণের মতে, "প্রাচীন গদ্যে রচিত উপনিষদের মধ্যে শুদ্ধ ভাবনা বেশী, আর পরবর্তীকালের উপনিষদে ধর্মীয় উপাসনা এবং ভক্তিই বেশী"।

রাধাকৃষ্ণণের মন্তব্য

---

1. *S. Radhakrishnan :* Indian philosophy, vol 1 P. 143

৫। বেদ থেকে উপনিষদের ক্রমবিকাশ (Transition from the Vedas to the Upanisad) :

বেদে যে স্বতঃস্ফূর্ত এবং স্বাভাবিক দার্শনিক চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটেছিল ব্রাহ্মণগুলির ক্রিয়া কলাপের মধ্যে তা হারিয়ে যায়। এর ফলে যে দার্শনিক প্রতিক্রিয়া ঘটে তাই উপনিষদের মধ্য দিয়ে রূপ লাভ করে। বিষয়বস্তুর স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যের বিচারে উপনিষদকে বৈদিক সংহিতা ও ব্রাহ্মণ নিরপেক্ষ এক ভিন্ন ধরনের সাহিত্য বলে গণ্য করা হয়। বৈদিক সংহিতায় বিভিন্ন দেবতায় যে সাধারণ বিশ্বাস সূচিত হয়েছে, সেই বিশ্বাসের স্থান দখল করে ব্রাহ্মণগুলির যান্ত্রিক যাজকীয়তা। বেদের ধর্মের রূপটির পরিবর্তন সাধন না করে তার নীতিকরণের প্রচেষ্টা উপনিষদে লক্ষ্য করা যায়।

উপনিষদ এক ভিন্ন ধরনের সাহিত্য

বেদ থেকে ঔপনিষদিক চিন্তাধারার ক্রমবিকাশে নিম্নলিখিত পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যেতে পারে

প্রথমতঃ, উপনিষদের দার্শনিক চিন্তাধারার মূলে রয়েছে অদ্বৈতবাদী চিন্তাধারার অস্তিত্ব। উপনিষদে যে অদ্বৈতবাদী চিন্তাধারায় পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছে ঋগ্‌বেদ সংহিতায় তার বীজ নিহিত আছে। জগতের সব কিছুর মূলে এক চৈতন্য সত্তার অস্তিত্ব, এই হল অদ্বৈতবাদের মূল কথা। ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্তে এক পরম পুরুষের বর্ণনা পাওয়া যায়, বিশ্বের যাবতীয় বস্তুকে যার অংশ রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। উপনিষদে এক পরম সত্তার কথা বলা হয়েছে, যিনি সর্বশক্তিমান, অনন্ত, অসীম, এই জগতের স্রষ্টা, পালক ও সংহারক। তিনিই এই জগতের আলোক ও প্রাণ। তিনি অদ্বিতীয় এবং একমাত্র পূজা ও উপাসনার বস্তু। বেদের অর্দ্ধ দেবতার বদলে দেখা দিল এক প্রকৃত দেবতা।

উপনিষদে অদ্বৈতবাদী চিন্তাধারার পরিপূর্ণ বিকাশ

[1]শাকল্য যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'দেবতারা ঠিক ক'জন ?' যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, 'এক'। যখন আবার প্রশ্ন করা হল অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, কাল, প্রাণ,

1. বৃহদার, ৩।৯।১

অগ্নি, ব্রহ্মা, রুদ্র এবং বিষ্ণু এদের মধ্যে কার উপাসনা শ্রেয়, তখন তার উত্তরে বলা হল, এরা সকলেই এক সর্বোত্তম, অমর, অশরীরী ব্রহ্মের প্রকাশ। সুতরাং এক ব্রহ্মেরই ধ্যান করা যেতে পারে। বেদের বহু দেবতাকে উপনিষদে একের অধীনে আনা হয়েছে। ব্রহ্ম ছাড়া অগ্নির পক্ষে দহন করা বা বায়ুর পক্ষে বহা সম্ভব নয়। 'তাঁর ভয়ে, অগ্নি দহন করে, তাঁর ভয়ে সূর্য্য কিরণ দেয়, তাঁর ভয়ে, বায়ু মেঘ এবং মৃত্যু নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদন করে। সময় সময় বিভিন্ন দেবতাকে এক সমগ্রের অংশ রূপে কল্পনা করা হয়েছে।

বিভিন্ন দেবতা এক সমগ্রের অংশ

দ্বিতীয়তঃ, বেদ থেকে উপনিষদে যে চিন্তাধারার ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যায় তার মধ্যে একটি লক্ষণীয় বিষয় হল বেদ ও উপনিষদের দর্শনের মধ্যে ব্যবহারিক দিকের পার্থক্য। বেদে যে আধ্যাত্মিক অনুশীলনের কথা বলা হয়েছে তা হল বহির্মুখী আর উপনিষদে এই অনুশীলন হল অন্তর্মুখী। আত্মোপলব্ধির জন্য যে অন্তর্মুখীনতার প্রয়োজন উপনিষদ তা স্বীকার করে।

উপনিষদের আধ্যাত্মিক অনুশীলন অন্তর্মুখী

তৃতীয়তঃ, বেদ থেকে উপনিষদের ক্রমবিকাশে অপর লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল বহির্মুখী ধর্ম থেকে অন্তর্মুখী ধর্মে রূপান্তর। ঋগ্বেদে জড় প্রকৃতির বিভিন্ন জড়বস্তু যেমন—ঝড়, ঝঞ্ঝা, মেঘ, বিদ্যুৎ, বৃষ্টি, বন্যা, দাবাগ্নি প্রভৃতির অধিষ্ঠাতা রূপে এক একটি দেবতার বন্দনা করা হয়েছে। মন্ত্রে এদের প্রশস্তি করা হয়েছে। কাজেই বৈদিক ধর্ম হল বহির্মুখী, আর উপনিষদের ধর্ম হল অন্তর্মুখী। বৈদিক ঋষিরা সৃষ্টির বৈচিত্র্যে বিস্মিত হয়ে প্রাকৃতিক শক্তিকে দেবতরূপে পূজা করেছেন। উপনিষদের ঋষিরা আত্মাতেই দেবতার সন্ধান পেলেন। উপনিষদে অন্তর জগতের গভীরতা অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। বাহ্য জাগতিক বস্তু থেকে উপনিষদের দৃষ্টি ধাবিত হল মনের অন্তরালে অবস্থিত অমর আত্মারপ্রতি।

বহির্মুখী ধর্ম থেকে অন্তর্মুখী ধর্মে রূপান্তর

তথাকথিত দেবতা নয়, আত্মারই ধ্যান করতে হবে। মানুষের অন্তরেই ঈশ্বরের আবির্ভাব। তৈত্তিরীয়োপনিষদে বলা হয়েছে, "হে দেব, তুমি

ব্রহ্মের কোশ স্বরূপ"[1]। বৃহদারণ্যকোপনিষদে আত্মাকে ব্রহ্মরূপে প্রত্যক্ষ করার কথা বলা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে, 'যে কেহ আমি ভিন্ন এবং আমার (উপাস্য) ইনি ভিন্ন এই মনে করে (আপনা থেকে) পৃথকাভূত দেবতাকে উপাসনা করেন তিনি অবিদ্যাবান, দেবতাদের কাছে তিনি পশুর সদৃশ। অন্তরস্থ অমর আত্মা এবং মহান জাগতিক শক্তি এক ও অভিন্ন। ব্রহ্মই আত্মা, আত্মাই ব্রহ্ম। ছান্দোগ্যোপনিষদে বলা হয়েছে, এই সমস্ত জগৎ স্বরূপতঃ ব্রহ্মই. কারণ তা থেকেই ওটি জাত হয়, তাঁতে লীন হয় ও তাঁতে জীবিত থাকে।[2] আবার বলা হয়েছে 'যিনি সর্বকর্মা, সর্বকাম, সর্বগন্ধ, সর্বরস, তিনি সমস্ত কিছু ব্যপ্ত হয়ে বিদ্যমান। তিনি ইন্দ্রিয়শূন্য ও আগ্রহ বিবর্জিত। ইনিই হৃদয়পদ্ম মধ্যে অবস্থিত আমার আত্মা, ইনি ব্রহ্ম।' বৈদিক উপাসনা ও ক্রিয়াকলাপের পরিবর্তে আমরা উপনিষদে পাই, ভাবনা, মনঃসংযোগ ও ধ্যান।

ব্রহ্মই আত্মা, আত্মাই ব্রহ্ম

চতুর্থতঃ, বেদ থেকে উপনিষদের ক্রমবিকাশে আর একটি বৈশিষ্ট্য হল বেদের কল্পনা ও আবেগের বদলে উপনিষদে দেখি চিন্তা ও যুক্তিতর্ক। উপনিষদের ঋষিদের লক্ষ্য ছিল সত্যের অনুসন্ধান। তাঁদের লক্ষ্য ছিল দেব দেবীকে সন্তুষ্ট করা নয়, অন্তরস্থ আত্মার উপলব্ধি। উপনিষদে বৈদিক ঋষিদের শিশুসুলভ মনোভাবের পরিবর্তে যা অস্তিত্বশীল তার প্রতি অপরিতৃপ্তির মনোভাব সূচিত হয়েছে।

আবেগের স্থান দখল করেছে চিন্তা ও যুক্তিতর্ক

পঞ্চমতঃ, উপনিষদে বেদের তুলনায় নৈতিক উদ্দেশ্যর দিকটি অধিকতর সুস্পষ্ট। উপনিষদের পরমার্থ হল আত্মোপলব্ধি।

বৈদিক দিকটি অধিকতর সুস্পষ্ট

বেদ থেকে উপনিষদের ক্রমবিকাশে আরএকটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য, বেদের প্রতি উপনিষদের উপেক্ষা। উপনিষদের ঋষিরা ছিলেন অতীন্দ্রিয়বাদী। অতীন্দ্রিয়বাদীর কাছে আত্মোপলব্ধির থেকে বড় কিছু নেই। আত্মোপলব্ধির পর তার আর বেদ বা অন্যান্য শাস্ত্রে কোন আকর্ষণ থাকে না। কাজেই বেদের পবিত্রতার প্রতি উপনিষদের মনোভাব

উপনিষদের বেদকে উপেক্ষা

1. তৈত্তি, ১।৪।১ 2. ছান্দো, ৩.১৪।১

অনুকূল নয়। বেদের প্রতি উপনিষদের দুরকম মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। একদিকে বলা হয়েছে যে বেদের উৎপত্তি অলৌকিকভাবে ঘটেছে। বৃহদারণ্যকোপনিষদে বলা হয়েছে, যেমন আর্দ্র কাষ্ঠের দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নি থেকে নানাবিধ ধূম বিনির্গত হয়, তেমন ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা, রহস্যবিদ্যা, শ্লোকসকল, সূত্রসমুদয়, অণু ব্যাখ্যাসকল ও ব্যাখ্যাসমূহ এই সমস্তই পরমাত্মার নিঃশ্বাস। আবার অপর দিকে একথাও বলা হয়েছে যে যথার্থ ঐশ্বরিক অন্তঃদৃষ্টির তুলনায় বৈদিক জ্ঞান নিকৃষ্ট। ছান্দোগ্যোপনিষদে নারদ সনৎকুমারকে বলছেন "হে ভগবন, আমি ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, চতুর্থস্থানীয় অথর্ববেদ, পঞ্চমস্থানীয় ইতিহাস পুরাণ সবকিছুই অবগত আছি, কিন্তু এরূপ জ্ঞানবান হয়েও আমি কেবল মন্ত্রবিদ হয়েছি, আত্মবিদ্ হইনি।[1] মুণ্ডকোপনিষদে বলা হয়েছে যে দুটি বিদ্যা জানার আছে, একটি পরা ও অপরটি অপরা।[2] তন্মধ্যে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ এগুলি অপরা বিদ্যা আর যে বিদ্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায় তাকে বলা হয় পরাবিদ্যা। ভূতবর্গের কারণ ব্রহ্মকে যে বিদ্যার সাহায্যে বিবেকীরা দর্শন করেন তাকেই পরাবিদ্যা বলে।

বিভিন্ন উপনিষদের বক্তব্য

বেদ থেকে উপনিষদের ক্রমবিকাশের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল বৈদিক মন্ত্রের মধ্য দিয়ে যে ধর্ম প্রকাশিত হয়েছে তা হল যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানের। মানুষের সঙ্গে দেবতার সম্পর্ক অনেকটা যান্ত্রিক। উপনিষদের মধ্যে আমরা আধ্যাত্মিক জীবনের এক নতুন উৎসের সন্ধান পাই। উপনিষদে স্পষ্টই ঘোষণা করা হল যে যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জীব মোক্ষলাভ করতে পারবে না। জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভিন্নতার জ্ঞানের মধ্য দিয়েই সে মোক্ষলাভ সম্ভব হবে। উপনিষদ মোক্ষলাভের জন্য যাগযজ্ঞের নিরর্থকতা ও আচার অনুষ্ঠানের ব্যর্থতার কথা ঘোষণা করল। আত্মাই ব্রহ্ম-এই হল অধ্যাত্ম উপাসনা। অধ্যাত্ম উপাসনার মধ্য

উপনিষদে আধ্যাত্মিক জীবনের নূতন উৎসের সন্ধান

1. ছান্দোগ্য ৭।১।৩ 2. মুণ্ডকে ১।১।৪

দিয়েই ঈশ্বর লভ্য, বাহ্য আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নয়। ছান্দোগ্যোপনিষদে বলা হয়েছে, 'যিনি এই ওঙ্কাররূপ অক্ষরকে জানেন এবং যিনি জানেন না, তাঁরা উভয়েই এই অক্ষরেরই দ্বারা কর্ম করে থাকেন বটে, পরন্তু উপাসনা ও উপাসনাহীন কর্মের জ্ঞান থেকে বিভিন্ন ফল হয়। বিজ্ঞান, শ্রদ্ধা ও উপাসনাদি সহকারে যে কর্ম করা হয় তা অধিক ফলপ্রদ হয়"।

আত্মোপলব্ধিই উপনিষদের লক্ষ্য

৬। উপনিষদের সমস্যাবলী (The Problems in the Upanisad) :

উপনিষদের দর্শন বিস্তারিত আলোচনা করার পূর্বে উপনিষদের যে প্রধান প্রধান সমস্যা আলোচিত হয়েছে সেগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে।

(১) সেই বস্তুটি কি, যাকে জানা হলে সব কিছুই জানা হয় ? :

উপনিষদের ঋষিদের লক্ষ্য ছিল পরমতত্ত্বের জ্ঞান লাভ করা। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে জগতের এই প্রকাশমান রূপের অন্তরালে এমন কোন আত্মার অস্তিত্ব আছে যাকে জানলে মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয় শান্তি লাভ করতে সক্ষম হয়। যা অস্তিত্বশীল, তার প্রতি অসন্তোষ থেকেই দার্শনিক অনুসন্ধানের কাজ শুরু হয়। ইন্দ্রিয় আমাদের অবভাসের জ্ঞান দেয়, যথার্থ আত্মার জ্ঞান দিতে পারে না। বহুর মধ্যে একের, বিভেদের মধ্যে অভেদের জ্ঞান লাভই মানুষের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা। মুণ্ডকোপনিষদে গৃহস্থাগ্রণী শৌনক অঙ্গিরার সমীপে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন 'হে ভগবন্, কোন বস্তুটি বা এমন কোন্ উপাদান—কারণ আছে যা বিশেষভাবে অবগত হলে এই কার্য্যস্থানীয় অখিল বস্তু বিজ্ঞাত হয় ?'[1]

পরমাত্মাকে জানার সমস্যা

(২) জগৎকারণ কি ?—[2]শ্বেতাশ্বতরো উপনিষদের শুরুতেই ব্রহ্মবাদিগণ, পরস্পরকে প্রশ্ন করছেন—হে ব্রহ্মজ্ঞগণ, ব্রহ্ম কি জগৎকারণ ? আমরা কোথা

1 মুণ্ডকো, ১।১।৪

2. শ্বেতাশ্বতরো, ১।১।

থেকে উৎপন্ন হয়েছি, কার দ্বারা জীবিত আছি এবং অবশেষে কোথায় অবস্থান করি? কার পরিচালনাধীনে আমাদের সুখদুঃখভোগের ব্যবস্থা হয়ে থাকে। পুনর্জন্ম, আত্মার অমরত্ব, কর্মফল এই সব আলোচনার প্রসঙ্গে যে সব মূল প্রশ্নের আবির্ভাব হয় তা হল—মৃত্যুর পর কি থাকে? শ্বেতাশ্বতরো উপনিষদে বলা হয়েছে, 'বৃক্ষ কর্তিত হলেও পুনর্বার অভিনবরূপে মূল থেকে উদ্গত হয়। মানুষ মৃত্যুকবলিত হলে কোন মূল থেকে পুনর্বার আবির্ভূত হয়?"

জগৎ কারণকে জানার সমস্যা

(৩) **মনোজগতে এবং জড়জগতে পরমতত্ত্ব সম্পর্কে অনুসন্ধান**—পরমতত্ত্ব সম্পর্কে অনুসন্ধান উপনিষদের অন্যতম লক্ষ্য। এই তত্ত্বকে কখনও প্রাণ, কখনও মন, কখনও বিচারবুদ্ধি বা কখনও আত্মা নামে অভিহিত করা হয়েছে। দেহ যখন নিদ্রিত অবস্থায় থাকে তখন সে কি যেটি থাকে এবং সদা সৃষ্টিশীল? মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উপনিষদ সেই তত্ত্বকে জানতে চায় যেটি মানুষের জাগ্রত স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি—এই তিনাবস্থায় বিদ্যমান,। [1]কোনোপনিষদে শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করছে, "কার অভিপ্রায়ানুসারে নিয়োজিত হয়ে মন স্ববিষয়ে ধাবিত হয়? কার দ্বারা প্রেরিত হয়ে সর্বপ্রধান প্রাণ স্বকার্য্যে গমন করে? কার অভিপ্রায়ানুসারে মানুষ এই বাক্য উচ্চারণ করে? কোন জ্যোতিষ্মান্ই বা চক্ষু ও শ্রোত্রকে স্ব স্ব বিষয়ে নিযুক্ত করেন?

পরমতত্ত্বকে জানার সমস্যা

(৪) **আত্মলাভের উপায় কি?**—আত্মাকে কেমন করে লাভ করা যায় উপনিষদের অন্যতম সমস্যা। [2]মুণ্ডকোপনিষদের ঋষি বলেন, "সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা সম্যগ্‌জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্যেণ নিত্যম্।" অর্থাৎ সত্য, তপস্যা, জ্ঞান ও ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারাই আত্মাকে লাভ করা যায়। [3]কঠোপনিষদের একটি শ্লোকে বলা হয়েছে, "এই আত্মাকে উত্তম বচনের দ্বারা, মেধার দ্বারা বা বহু শাস্ত্র শ্রবণের

আত্মলাভের সমস্যা

1, কেনো. ১।১
2. মুণ্ডকোনোনিষদ. ৩।১।৫
3. কঠোপনিষদ, ১।২।২৩

দ্বারা জানা যায় না। যাঁর প্রতি ইনি অনুগ্রহ করেন, তিনিই তাঁকে লাভ করেন—তাঁর কাছেই আত্মা নিজের স্বরূপ প্রকাশ করেন।

(৫) **জগতের স্রষ্টা, পালক ও সংহারক কে?**—উপনিষদে জগতের মূল কারণ, স্রষ্টা, পালক ও সংহারক কে সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করা হয়েছে।

জগতের স্রষ্টা, পালক ও সংহারককে জানার সমস্যা

প্রথমতঃ জড় জগতে তাকে অনুসন্ধান করা হল। বিফল হবার পর তাকে মনোজগতে অনুসন্ধান করা হতে লাগল। অবশেষে অতীন্দ্রিয় অনুভূতির মাধ্যমে তার সন্ধান পাওয়া গেল এবং উপনিষদের আধ্যাত্মিক, নৈতিক এবং মনোবৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান অতীন্দ্রিয়বাদে পরিণতি লাভ করল।

(৬) **ব্যবহারিক সমস্যার আলোচনা**—উপনিষদের সমস্যাগুলি প্রধানতঃ ব্যবহারিক সমস্যা, নৈতিক ও ধর্মীয় সমস্যা, দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা।

ব্যবহারিক সমস্যার আলোচনা

সত্যের জ্ঞানলাভ করাই শুধুমাত্র উপনিষদের লক্ষ্য ছিল না। সত্যোপলব্ধিও তার লক্ষ্য ছিল। সত্যকে কিভাবে লাভ করা যেতে পারে?—এই ছিল তার প্রশ্ন। এই কারণেই বৃহদারণ্যকোপনিষদে ঋষিদের কণ্ঠে যে প্রার্থনা উচ্চারিত হয়েছে তা হল—"অসৎ থেকে আমায় সতে নিয়ে যাও, 'অন্ধকার থেকে আমায় আলোকে নিয়ে যাও' এবং মৃত্যু থেকে আমায় অমৃতে নিয়ে যাও।"

৭। ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের উৎস রূপে উপনিষদ (Upanisad as sources of Indian philosophical systems):

ব্লুমফিল্ড (*Bloomfield*) তাঁর '*The Religion of the Vedas*' গ্রন্থে বলেছেন, 'যে এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ হিন্দু চিন্তাধারা নেই, উপনিষদে যার মূল নিহিত নেই, নাস্তিক বৌদ্ধধর্মকেও এর অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।' সাংখ্য-যোগ, ন্যায়-বৈশেষিক, বেদান্ত সকলেরই দার্শনিক চিন্তাধারার মূল উপনিষদে খুঁজে পাওয়া যায়।

আমরা নাস্তিক ও আস্তিক, কয়েকটি দর্শন সম্প্রদায়ের দার্শনিক চিন্তার মূল কিভাবে উপনিষদে নিহিত এবার আলোচনা করব।

(ক) উপনিষদ এবং বৌদ্ধধর্ম (Upanisad and Buddhism) ঃ

ওল্ডেনবার্গ (*Oldenberg*)-এর মতে উপনিষদই বৌদ্ধধর্মের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে। উপনিষদের কর্মবাদই বৌদ্ধদের ক্ষণিকত্ববাদের প্রেরণার উৎস-স্বরূপ এবং বৌদ্ধধর্মের আরও অনেক মতবাদের উৎপত্তি উপনিষদ থেকেই হয়েছে। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে উপনিষদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নিম্নলিখিত বিষয়গুলি থেকে জানা যায়।

বৌদ্ধ দর্শনের ক্ষণিকত্ব-বাদ, নৈরাত্মবাদ, দুঃখবাদ প্রভৃতির মূল উপনিষদে নিহিত

বৌদ্ধদর্শনের নৈরাত্মবাদের মূল উপনিষদেই নিহিত। কঠোপনিষদে এর উৎপত্তি খুঁজে পাওয়া যায়। [1]কঠোপনিষদে নচিকেতা যমকে বলছেন, "মানুষের মরণ হলে এই যে সংশয় উপস্থিত হয় কেহ বলে, 'পরলোকগামী আত্মা আছে, কেহ বলে, তিনি নেই—আপনার উপদেশ থেকে আমি এই আত্মার অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব জানতে চাই।"

বৌদ্ধ দর্শনের দুঃখবাদ এবং ক্ষণিকত্ববাদের মূলও উপনিষদে নিহিত। নচিকেতাকেই উপনিষদে বলতে শোনা যায়, 'সবই দুঃখ', 'সবই ক্ষণিক'।

বৌদ্ধদের সন্ন্যাসজীবনের মূল [2]বৃহদারণ্যকোপনিষদে নিহিত দেখা যায়। সেখানে বলা হয়েছে 'পরিব্রাজকগণ এই আত্মাকে পাবার ইচ্ছায় পরিব্রজ্যা অবলম্বন করেন। এই পরিব্রজ্যার কারণ এই—'আমাদের যাদের কাছে এই আত্মাই একমাত্র অভিপ্রেত ফল সেই আমরা সন্তান প্রভৃতির দ্বারা কি করব? এই মনে করে প্রাচীন ব্রহ্মজ্ঞেরা মোটেই সন্তান কামনা করেননি। তাঁরা পুত্র কামনা, বিত্ত কামনা ও লোক কামনা থেকে বিরত হয়ে ভিক্ষাটন অবলম্বন করেছিলেন।

আত্রেয় উপনিষদে বিজ্ঞানবাদের ও কঠোপনিষদে পুনর্জন্মবাদের মূল নিহিত

বিজ্ঞানবাদের তত্ত্ববিদ্যা ও জ্ঞানবিদ্যার মূলও আত্রেয় উপনিষদে নিহিত। যেখানে বলা হয়েছে যে এই জগতের সব কিছু চেতনা থেকে উদ্ভূত।

---

1. কঠো. ১।১।২০
2. বৃহ. ৪।৪।২২

বৌদ্ধ দর্শনের পুনর্জন্মবাদের মূলও কঠোপনিষদে নিহিত যেখানে বলা হয়েছে আত্মা কর্ম ও জ্ঞানানুযায়ী নতুন নতুন দেহ পরিগ্রহ করে। (কঠোপনিষদ ২। ২। ৭)

(খ) উপনিষদ এবং সাংখ্য (The Upanisad and the Sankhya) ঃ

গার্বে (*Garbey*) উপনিষদের সঙ্গে সাংখ্যের সম্বন্ধের ব্যাপারে আলোকপাত করেছেন। যদিও সাংখ্য শব্দটি শ্বেতাশ্বতরো উপনিষদে সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয়েছে, সাংখ্য দর্শনের নীতিগুলি প্রাচীন উপনিষদে দেখা যায়। সাংখ্যের সঙ্গে উপনিষদের সম্বন্ধ নিম্নলিখিতভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

শ্বেতাশ্বতরো উপনিষদে প্রকৃতি ও গুণের উল্লেখ

প্রকৃতি এবং সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণের উল্লেখ শ্বেতাশ্বতরো উপনিষদে পাওয়া যায় যেখানে কারণস্বরূপা প্রকৃতিকে ত্রিবর্ণা বলা হয়েছে। (অজামেকাং লোহিত শুক্ল কৃষ্ণাং বহ্বীর প্রজাঃ সৃজমানাঃ সরূপাঃ ৪।৫)[1]। বলা হয়েছে যে ‘যে নিত্যা, অদ্বিতীয়া, তেজোরূপিনী, তুল্যাকারা প্রকৃতি অসংখ্য প্রজা সৃষ্টি করেছেন। নিত্য বিজ্ঞানাত্মা সেই প্রকৃতির সেবা করে অজ্ঞান তিমির পরিত্যাগ করেন। প্রকৃতির আশ্রয়ে ভোগ্য পদার্থ ভোগ করে আত্মা আচার্য্যাদির উপদেশ বাক্যে কামকর্মাদি পরিত্যাগ করে থাকেন।’ কার্যত্রয়ের গুণানুসারে প্রকৃতিকে ত্রিবর্ণবিশিষ্টা বলা হয়েছে। ঐ প্রকৃতি তেজ জল ও অন্নস্বরূপা। ঐ তিন বস্তুর বর্ণ লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণ।

কঠোপনিষদে সাংখ্যের মহৎ, অব্যক্ত ও পুরুষের ধারণার উল্লেখ

সাংখ্যের মহৎ, অব্যক্ত ও পুরুষের ধারণার উল্লেখ কঠোপনিষদে পাওয়া যায়। কঠোপনিষদে বলা হয়েছে ইন্দ্রিয় থেকে বিষয়সমূহ অবশ্যই শ্রেষ্ঠ এবং অর্থসমূহের তুলনায় মন শ্রেষ্ঠ, মন থেকেও বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ এবং বুদ্ধি থেকে মহৎ (হিরণ্যগর্ভ) শ্রেষ্ঠ। মহৎ থেকে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত থেকে পুরুষ শ্রেষ্ঠ, পুরুষ থেকে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নেই। পুরুষই সকলের পরাকাষ্ঠা, তিনিই পরমগতি।[2]

---

1. শ্বেতাশ্বতরো
2. কঠোপনিষৎ, ১।৩।১০—১২

(গ) উপনিষদ ও যোগ (The Upanisad and the yoga) ঃ

যোগ দর্শনের একাধিক বিষয়ের উল্লেখ শ্বেতাশ্বতরো উপনিষদে দেখা যায়। যোগের অষ্টাঙ্গ মার্গের আসন, প্রত্যাহার, প্রাণায়াম প্রভৃতির উল্লেখ শ্বেতাশ্বতরো উপনিষদে লক্ষ্য করা যায়। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে প্রাণায়াম প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে যোগতত্ত্ববিদ ব্যক্তি মস্তক, গ্রীবা ও বক্ষ সমুন্নত করে, শরীরকে সরলভাবে স্থাপন করে, ইন্দ্রিয়গুলিকে মনের সাহায্যে হৃদয়ে সংনিয়মিত করে সদ্‌গুরুর কাছ থেকে পাওয়া ব্রহ্মতত্ত্ব চিন্তা করবেন। প্রাণায়ামের প্রণালী ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে যোগাভিজ্ঞ যোগী যোগমার্গে পঞ্চপ্রাণকে সংযত করবেন। প্রাণবায়ু ক্ষীণ হলে নাসিকামধ্য দিয়ে শ্বাস ত্যাগ করবেন। এই ভাবে অভ্যাসের দ্বারা বায়ু ধারণ করলে চিত্ত নিশ্চল ভাবে অবস্থান করে।[1]

শ্বেতাশ্বতরো উপনিষদে যোগের বিভিন্ন বিষয়ের উল্লেখ

অষ্টাঙ্গিক যোগমার্গে যে ধারণার কথা বলা হয়েছে কঠোপনিষদে তার উল্লেখ দেখা যায়। কঠোপনিষদে বলা হয়েছে যে অবস্থায় মনের সঙ্গে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ব্যাপারশূন্য হয় এবং বুদ্ধিও স্বকার্যে ব্যাপৃত হয় না, সেই অবস্থাকেই জ্ঞানিগণ উত্তমগতি বলে থাকেন। বাহ্যেন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয়সকলকে অচলভাবে ধারণ করা রূপ যে অবস্থা তাকে যোগিগণ যোগশব্দে অভিহিত করেন।[2]

কঠোপনিষদে অষ্টাঙ্গিক যোগমার্গের ধারণা

অষ্টাঙ্গিক যোগমার্গে যে ধ্যানের কথা বলা হয়েছে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে তার উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। শ্বেতাশ্বতরো উপনিষদের এক জায়গায় বলা হয়েছে নিজের শরীরকে অগ্ন্যাধান কাষ্ঠবিশেষ ও ওঙ্কারকে ঘর্ষনকাষ্ঠ স্বরূপ কল্পনা করে পুনঃ পুনঃ ধ্যান-রূপ মথনের দ্বারা (অগ্নির মতন) লুক্কায়িত জ্যোতির্ময় পরমাত্মাকে দর্শন করবে।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে ধ্যানের উল্লেখ

---

1. শ্বেতাশ্বতরো ২।৮—৯
2. কঠোপনিষৎ—২।৩.১১

যোগদর্শনের ঈশ্বরের বর্ণনা কঠোপনিষদে দেখা যায়। কঠোপনিষদে এক জায়গায় বলা হয়েছে যে সূর্য্য যেমন জীবমাত্রের দর্শনের হেতু হয়েও চাক্ষুষ পাপ ও অশুচি দর্শনাদিরূপ বাহ্যদোষের দ্বারা লিপ্ত হন না, সেরূপ নিখিল জীবের আত্মা এক হয়েও জাগতিক দুঃখে লিপ্ত হন না।[1]

কঠোপনিষদে যোগ-দর্শনের ঈশ্বরের বর্ণনা

যোগদর্শনের জাগতিক দিকের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় কৌষীতকি এবং মৈত্রেয়ী উপনিষদে।

(ঘ) **ন্যায়-বৈশেষিক এবং উপনিষদ** (Nyaya-Vaisesika and the Upanisad):

ন্যায়-বৈশেষিক এবং উপনিষদের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ লক্ষ্য করা যায়। বৈশেষিক দর্শনের পদার্থের মধ্যে পাঁচটি মূল উপকরণ এবং কাল, মন, আত্মা আকাশের উল্লেখ শ্বেতাশ্বতরো উপনিষদে দেখা যায়। বৈশেষিক দর্শনের আকাশের গুণের কথা ছান্দোগ্য উপনিষদে উল্লিখিত হয়েছে। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের মোক্ষের ধারণার ভিত্তি হল উপনিষদ।

শ্বেতাশ্বতরো উপনিষদে বৈশেষিক দর্শনের পদার্থের উল্লেখ

(ঙ) **অদ্বৈত বেদান্ত এবং উপনিষদ** (Advaita Vedanta and the Upanisads):

উপনিষদের মধ্যে অদ্বৈতবাদের যে বীজ নিহিত আছে তার উপর ভিত্তি করে শঙ্করাচার্য্য সুসংহত বিশুদ্ধাদ্বৈত বা অদ্বৈত মতের প্রবর্তন করেন। শঙ্কর মতে ব্রহ্ম নির্গুণ, অনন্ত, অসীম ; জগৎ ব্রহ্মের মায়িক বিকাশ। উপনিষদেও বলা হয়েছে যে ব্রহ্ম নির্গুন, সর্বব্যাপক জগতের কারণ।[2] ছান্দোগ্য উপনিষদে শ্বেতকেতু ও আরুণির কথোপকথনের মধ্যে ব্রহ্মকেই জগৎকারণরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।[3] বৃহদারণ্যকোপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ীর কথোপকথনে বলা হয়েছে যে

উপনিষদে অদ্বৈতবাদের বীজ

1. কঠোপনিষৎ ২।২।১১
2. ছান্দোঃ, ৬।২।১
3. বৃহদাঃ, ৪।৬।২

'আত্মা দৃষ্ট, শ্রুত, বিচারিত ও বিজ্ঞাত হলেই সব কিছু জ্ঞাত হওয়া যায়। যার দ্বারা লোকে সব কিছুকে জানে তাকে কি দিয়ে জানা যায়? যাকে 'নেতি' 'নেতি' বলা হয় ইনিই সেই আত্মা। ইনি অগ্রহনীয়, কারণ ইনি গৃহীত হন না, ইনি অক্ষয়, কারণ এর ক্ষয় নেই। ইনি অসঙ্গ, কারণ এর আসক্তি নেই, ইনি বদ্ধ নন, কাজেই এর জন্ম নেই ও বিনাশ নেই। কাজেই সেই বিজ্ঞাতাকে কি দিয়ে জানবে?

শঙ্কর যেভাবে ব্রহ্ম ও আত্মার সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করেছেন তার ভিত্তিও উপনিষদের উপর। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে, "যিনি সর্বকর্মা, সর্বকাম, সর্বগন্ধ, সর্বরস, তিনিই সমস্ত ব্যাপি বিদ্যমান, তিনি ইন্দ্রিয়শূণ্য ও আগ্রহ-বিবর্জিত। ইনিই হৃদয়পদ্মমধ্যে অবস্থিত আমার আত্মা, ইনি ব্রহ্ম। দেহত্যাগের পর আমি এঁকেই পাব। একইভাবে, মুক্ত, কঠ এবং শ্বেতাশ্বতরো উপনিষদে ব্রহ্ম এবং আত্মাকে অভিন্ন গণ্য করা হয়েছে। [1]মুণ্ডকোপনিষদে বলা হয়েছে, 'যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিদ্, যাঁর জগদ্ব্যাপী মহিমা, সেই আত্মাই জ্যোতির্ময় হৃদয় পদ্মমধ্যস্থ আকাশে অবস্থিত আছেন।'

ব্রহ্ম ও আত্মার সম্বন্ধের ভিত্তিও উপনিষদকে কেন্দ্র করে

শঙ্করের মায়াবাদের মূলও উপনিষদে পাওয়া যায়। অজ্ঞতা, অসত্য, মৃত্যু, অসৎ, মিথ্যা. অধ্যাস, প্রকৃতি, নাম এবং রূপ প্রভৃতি শব্দের দ্বারা উপনিষদে মায়া শব্দকে বোঝান হয়েছে। এমন কি 'মায়া' শব্দটিও উপনিষদ থেকে নেওয়া হয়েছে।

উপনিষদে মায়াবাদের মূল

কোন কোন লেখকের মতে উপনিষদে মায়াবাদের পরোক্ষ সমর্থন আছে, প্রত্যক্ষ সমর্থন নেই। এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "[২]উপনিষদের মূল ভাবধারা বলে যে বিশ্বশক্তির স্বাভাবিক গতিই হল বিশুদ্ধ একক অবস্থা হতে বহু ও বিচিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করা। কারণ তিনি নিজেকে দুই করে, বহু করে আনন্দ পান.........." আরও বলা হয়েছে, "আমাদের এই সিদ্ধান্ত করা

1. মুণ্ডকো, ২।২।৭
২. হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, উপনিষদের দার্শনিক তত্ত্ব. উপনিষদ—অতুলচন্দ্র সেন, পৃঃ ৩৬)

অসঙ্গত হবে না যে উপনিষদের মূল ভাবধারা মায়াবাদকে সমর্থন করে না ; উপনিষদে মায়াবাদের বীজ আছে, কিন্তু তা পরিস্ফুট আকারে রূপ পেয়েছে শংকরাচার্য্যের নিজস্ব চিন্তায়"। এ-সম্পর্কে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

(চ) **উপনিষদ এবং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ** (Qualified Monism and the Upanisads) ঃ শঙ্করের দর্শনের মতন রামানুজের দর্শনেরও ভিত্তি হল উপনিষদ। রামানুজ পরমতত্ত্ব হিসেবে জীব, প্রকৃতি ও ঈশ্বরকে গ্রহণ করেছেন। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে বলা হয়েছে, "ভোক্তা জীব, ভোগ্য নিখিল পদার্থ এবং অন্তর্যামী ঈশ্বর—জ্ঞানীব্যক্তিদের দ্বারা প্রোক্ত এই ত্রিবিধ বস্তুকেই ব্রহ্মস্বরূপে জেনে সাধক উক্ত ব্রহ্মকে সর্বদা নিজের আত্মস্বরূপে জানবেন। কারণ এই ব্রহ্মজ্ঞানের অধিক আর কিছুই জানার নেই।

শ্বেতাশ্বতরো উপনিষদের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ভাবনা

রামানুজ ঈশ্বরকেই প্রকৃতির আত্মারূপে গ্রহণ করেছেন। যাজ্ঞবল্ক্য ঈশ্বরকে জগৎ ও জীব উভয়েরই আত্মারূপে গ্রহণ করেছেন। বৃহদারণ্যকোপনিষদে বলা হয়েছে যে 'রথচক্রের নাভিতে এবং নেমিতে যেমন সব চক্রশলাকাই সন্নিবিষ্ট থাকে, ঠিক তেমনি সব প্রাণী, সব দেবতা, সব লোক, সব ইন্দ্রিয় এবং সেই সমস্ত জীবাত্মা এই পরমাত্মাতে সমর্পিত রয়েছে।'

বৃহদারণ্যকোপনিষদে ঈশ্বরকে জগৎ ও জীবের আত্মা রূপে উল্লেখ

রামানুজের মোক্ষের ধারণা মুণ্ডকোপনিষদে পাওয়া যায়। মুণ্ডকোপনিষদে বলা হয়েছে, "বেদান্তজনিত বিজ্ঞানের বিষয় পরমাত্মা যাঁদের কাছে সুনিশ্চিত হয়েছে, সন্ন্যাস-যোগাবলম্বনে যাঁরা বিশুদ্ধচিত্ত হয়েছেন এবং যাঁরা যত্নশীল, তাঁরা সকলে পরমাত্মার সঙ্গে একীভূত হয়ে চরম দেহত্যাগকালে সর্বত্র নির্বাণ প্রাপ্ত হন।"

মুণ্ডকোপনিষদে মোক্ষের ধারণা

৮। উপনিষদের পদ্ধতি (Methods of the Upanisads) ঃ

'উপনিষদের দার্শনিকবৃন্দ তাঁদের আলোচনায় এবং উপদেশে বিভিন্ন ধরণের পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। তাঁদের অনুসৃত প্রধান প্রধান পদ্ধতিগুলি নিম্নরূপ :

(ক) **সূত্রমূলক পদ্ধতি (Aphoristic method)ঃ** উপনিষদের এই পদ্ধতি পরবর্তীকালের দার্শনিক রচনার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়েছে। এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হল সূত্র বা জ্ঞানগর্ভ সংক্ষিপ্ত উক্তির মধ্য দিয়ে দার্শনিক চিন্তাধারার প্রকাশ, যেগুলির তাৎপর্য উপলব্ধির জন্য বুদ্ধির প্রয়োজন। এই কারণেই বিভিন্ন ভাষ্যকার একই সূত্রের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সূত্রের উদ্দেশ্য ছিল বিস্তারিত ভাবকে সংক্ষিপ্ত রূপ দেওয়া। সূত্রের আকার যত সংক্ষিপ্ত হয়, কণ্ঠস্থ করার পক্ষে তত সহজ হয়। কিন্তু এই সূত্রগুলির অর্থ সব সময় সহজবোধ্য ছিল না। তাই প্রয়োজন দেখা দিল ভাষ্য বা টীকার। মাণ্ডুক্য উপনিষদে বলা হয়েছে, 'এই সমস্তই 'ওম'—এই অক্ষরাত্মক। ওঙ্কার ব্রহ্ম-প্রাপ্তির একটা উপায়। সে কারণে ওঙ্কার ব্রহ্মের সমীপবর্তী। সেই ওঙ্কারের সুস্পষ্ট নির্দেশ কথিত হচ্ছে। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান—এই সমস্তই ওঙ্কার এবং অপর যা কিছু ত্রিকালের অতীত তাও ওঙ্কার। এই সমস্তই ব্রহ্ম। এই আত্মা ব্রহ্ম। উক্ত এই আত্মা চতুষ্পাদ্য। জাগ্রদবস্থা যাঁর ভোগস্থান, যিনি বহির্বিষয়ে অনুভূতিসম্পন্ন, যাঁর সাতটি অঙ্গ, যাঁর উনিশটি মুখ, যিনি স্থূল বিষয় ভোগ করেন--সেই বৈশ্বানরই আত্মার প্রথম পাদ। স্বপ্নাবস্থা যাঁর ভোগস্থান, যিনি অন্তঃপ্রজ্ঞ, যাঁর সাতটি অঙ্গ, যাঁর উনিশটি মুখ, যিনি শুধু বাসনা ভোগ করেন, সেই তৈজসই আত্মার দ্বিতীয় পাদ। বেদান্ত দর্শনে এই অংশের বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

(খ) **শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় ও মূল বুৎপত্তি সংক্রান্ত পদ্ধতি (Etymological method)ঃ** এই পদ্ধতিতে কোন একটি শব্দের অর্থ তার মূল বুৎপত্তির সাহায্যে ব্যাখ্যাত হয়। [1]বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে যে 'পুরুষ' হল পুরিশয়ঃ অর্থাৎ হৃদয়পুরে শয়নকারী। এই ধরনের উদাহরণ অন্যান্য উপনিষদেও দেখা যায়।

1, বৃহদা, ২।৫।১৮

(গ) **পৌরাণিক কাহিনী-মূলক পদ্ধতি (Mythical method)** : শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে উপনিষদে পৌরাণিক কাহিনীমূলক পদ্ধতি প্রায়ই প্রয়োগ করা হয়েছে। যেমন—কোন উপনিষদে ইন্দ্র এবং দৈত্যদের কাহিনী ব্যক্ত করা হয়েছে বিনয় শিক্ষাদানের জন্য। সময় সময় কারণতত্ত্বের ব্যাখ্যার জন্য কোন কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে। যেমন—সূর্যের বৃহৎ স্বর্ণডিম্ব থেকে বহির্গত হওয়ার কাহিনী। সময় সময় অতিপ্রাকৃত কাহিনীর অবতারণা করা হয়। যেমন—ঐতরেয়োপনিষদে বলা হয়েছে, কিভাবে আত্মা মস্তিকে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে জীবাত্মারূপে ব্যক্তির মধ্যে স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে। সময় সময় ব্যঙ্গ করার জন্যও কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে।

(ঘ) **উপমামূলক পদ্ধতি (Analogical method)** : যে সব বিষয় যুক্তির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না, সেগুলি উপমার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেমন—বৃহদারণ্যকোপনিষদের এক জায়গায় বলা হয়েছে 'অতি-ভারাক্রান্ত শকট যেমন উচ্চ শব্দ করতে করতে যায়, ঠিক তেমনি এই শরীরাধিষ্ঠিত জীবাত্মা যখন ঊর্দ্ধশ্বাসী হন, তখন পরমাত্মার দ্বারা অধিষ্ঠিত হয়ে শব্দ করতে করতে যান।'[1] আবার অন্যত্র বলা হয়েছে 'তৃনাশ্রিত জলৌকা যেমন তৃণের প্রান্তভাগে গমন করে অপর আশ্রয় অবলম্বন করে (সেখানে) আপনাকে উঠিয়ে নেয়, ঠিক তেমনি এই জীব এই শরীরকে ত্যাগ করে, ওকে অচেতন করে, অপর আশ্রয় অবলম্বন করে আপনাকে তথায় উঠিয়ে নেন।'[2]

(ঙ) **কথোপকথনের পদ্ধতি (Dialectical Method)** : উপনিষদে এই পদ্ধতির বহুল প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। এই পদ্ধতি অনুসারে দার্শনিকেরা একস্থানে সমবেত হয়ে বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেন। উপনিষদে বহু স্থানে এই জাতীয় আলোচনা লক্ষ্য করা যায়। কঠোপনিষদে নচিকেতা ও যমের কথোপকথনের এবং বৃহদারণ্যকোপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ির কথোপকথনের উল্লেখ করা যেতে পারে।

---

1. বৃহদা ৪।৩।৩৬। 2. বৃহদা, ৪।৪।৪

(চ) সংশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি (Synthetic Method) : এই পদ্ধতিতে কথোপকথনের মাধ্যমে যে আলোচনা করা হয় সেগুলিকে সংশ্লেষণাত্মক পদ্ধতির সাহায্যে সংশ্লিষ্ট করা হয়। বৃহদারণ্যকোপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ে যাজ্ঞবল্ক্য রাজা জনকের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর সংশ্লেষণ করেছেন। ছান্দোগ্য, প্রশ্ন এবং অন্যান্য উপনিষদে এই প্রকার বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ দেখা যায়।

(ছ) স্বগতোক্তিমূলক পদ্ধতি (Monologic Method) : যদিও উপনিষদে দার্শনিকরা খুব কমই নিজের কথা বলেন, তবু যখন তাঁরা বলতে আরম্ভ করেন তখন তাঁরা অপরের উপস্থিতির কথা ভুলে গিয়ে নিজে নিজে কথা বলে যেতে থাকেন। বৃহদারণ্যকোপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য আত্মার প্রকৃতি সম্পর্কে রাজা জনকের প্রশ্নের উত্তর দেবার পর স্বগতোক্তি করতে থাকেন। কঠোপনিষদে যম এবং নচিকেতার আলাপ আলোচনার সময় নচিকেতার তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় যম স্বগতোক্তি করতে থাকেন।

(জ) সময়োচিত পদ্ধতি (Temporising Method) : উপনিষদের উপদেষ্টা বা শিক্ষকবৃন্দ শিক্ষকদের মানসিক স্তর অনুযায়ী শিক্ষা দান করেন। সময়োচিত পদ্ধতিতে, অনুসন্ধানকারীর আধ্যাত্মিক স্তর যতই উন্নীত হতে থাকে, শিক্ষক তাঁকে যে কেবলমাত্র সম্মুখস্থ পথ নির্দেশ করেন তা নয়, তাকে ক্রমে ক্রমে সমগ্র সত্য ব্যাখ্যা করেন। ইন্দ্র এবং বিরোচনের কাহিনীতে দেখা যায় যে বিরোচন তাঁর শিক্ষক প্রজাপতির প্রথম উত্তরে খুশী হলেও, ইন্দ্র কিন্তু খুশী হলেন না এবং তাঁকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগলেন। প্রজাপতি তাঁকে আত্মার রহস্যের কথা প্রথম দেহে, তারপর, স্বপ্নে এবং সুষুপ্তিতে ব্যাখ্যা করলেন এবং তারপর তাঁর কাছে আত্মার প্রকৃত রূপ ব্যাখ্যা করলেন। এই পদ্ধতিতে অনুসন্ধানকারী নিজে সত্যকে বুঝতে চেষ্টা করেন এবং শিক্ষক কেবলমাত্র তাকে চালিত করেন।

(ঝ) প্রত্যাবর্তী পদ্ধতি (Regressive Method) : একের পর এক প্রশ্ন করে যাওয়া এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য। প্রতিটি নূতন প্রশ্নই পূর্ববর্তী প্রশ্নের উত্তরের পশ্চাতে আমাদের টেনে নিয়ে যায়। বৃহদারণ্য-

কোপনিষদে জনক যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করলেন, 'কোন্ জ্যোতি পুরুষের (ক্রিয়াদির) সহায়ক হয় ?' যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করলেন, 'হে সম্রাট, আদিত্য জ্যোতি।' জনক আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'সূর্য্য অস্তমিত হলে কোন জ্যোতি এই পুরুষের সহায়ক হয় ?' যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন, 'চন্দ্রই তার জ্যোতি হয়।' জনক আবার প্রশ্ন করলেন, যাজ্ঞবল্ক্য আবার উত্তর দিলেন এবং চন্দ্র থেকে অগ্নি, অগ্নি থেকে আত্মা অর্থাৎ আত্মজ্যোতি-সহায়েই সে বসে, চলে, কর্ম করে, ফিরে আসে—এই কথা ব্যক্ত করলেন। ঐ একই উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য এবং গার্গীর আলোচনাতেও ঐ প্রত্যাবর্তী পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

(ঞ) **হেঁয়ালিমূলক পদ্ধতি** (Enigmatic Method) : এই পদ্ধতির উদাহরণ আমরা দেখি শ্বেতাশ্বতরো উপনিষদে, যেখানে বলা হয়েছে, 'মায়াশক্তি যে পরমাত্মারূপ রথচক্রের প্রান্তভাগ, যিনি তিন গুণের দ্বারা আবৃত, ষোড়শ পদার্থ যার বিস্তারস্বরূপ, যার পঞ্চাশটি চক্রশলাকা এবং বিশটি চক্র শলাকার খিল, যিনি ছ'টি অষ্টকের সঙ্গে সংযুক্ত, যিনি নানাবিষয়ক একটি কামপাশের দ্বারা আবদ্ধ, ধর্ম, অধর্ম ও জ্ঞান যাঁর বিচরণক্ষেত্র এবং পুণ্য ও পাপবশতঃ যিনি মোহগ্রস্ত, সেই ব্রহ্মচক্রকে ব্রহ্মবাদিগণ দর্শন করেছিলেন।'

৯। জীবাত্মা (The Individual Self) :

জীবাত্মা দেহ, ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধি থেকে পৃথক। [1]শরীর হচ্ছে রথ, জীবাত্মা হল রথ-স্বামী, বুদ্ধি হল রথচালক এবং মন হল লাগাম; ইন্দ্রিয়গুলি হল অশ্ব এবং ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়গুলি হল অশ্বদের গমনের পথ। শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনসংযুক্ত জীবাত্মাই ভোগকর্তা, ইন্দ্রিয়গুলি মনের দ্বারা চালিত হয়, মন বুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়, বুদ্ধি আত্মার দ্বারা চালিত হয়। ইন্দ্রিয় থেকে মন শ্রেষ্ঠ, মন থেকে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধির থেকে আত্মা শ্রেষ্ঠ।[2] আত্মাই দেহে দেহস্বামীরূপে অবস্থিত। আত্মা দেহের সঙ্গে অসংযুক্ত হলে, অর্থাৎ দেহ থেকে বিযুক্ত হলে

জীবাত্মা দেহ, ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধি থেকে পৃথক

---

1. কঠো, ১।৩।৩-৪ 2. "মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ"—কঠো, ১।৩।১০

দেহে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।[1] ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধি আত্মার জ্ঞান ও ক্রিয়ার কারণস্বরূপ। আত্মা জ্ঞাতা, কর্তা এবং ভোক্তা। আত্মা সুখদুঃখ ভোগ করে, যা আত্মার কর্মফল। আত্মা শাশ্বত, চেতন, এবং বহু। আত্মা কারণান্তর থেকে উদ্ভূত হয়নি। আত্মা থেকেও কিছু উৎপন্ন হয়নি। আত্মা জন্মহীন, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ। শরীর নিহত হলেও আত্মার নাশ হয় না।

যে জীবাত্মা সকল সময় অসমাহিত মনের সঙ্গে সংযুক্ত, অবিবেকী ও ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র বন্ধনদশা লাভ করে এবং জন্মমরণরূপ সংসারগতি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যিনি বিবেকী, সংযতমনা ও সর্বদা পবিত্র তিনি ব্রহ্মকে লাভ করেন এবং বন্ধনদশা, জন্ম ও মরণ থেকে মুক্তিলাভ করেন।[2] জীব তার কর্মফলের দ্বারা পাপ পুণ্য অর্জন করে এবং সুখদুঃখ ভোগ করে। জীব পুণ্যের ফলে পুণ্যবান এবং পাপের ফলে পাপী হয়।[3] বৃহদারণ্যকোপনিষদে বলা হয়েছে, জীবাত্মা যেরূপ ক্রিয়া করেন, যেরূপ আচারী হন, সেইরকমই হয়ে থাকেন—শুভকারী হলে সাধু হন এবং পাপাচারী হলে পাপী হন; পুণ্যকর্মের ফলে পুণ্যবান এবং পাপ কর্মের ফলে পাপী হন। এর থেকে বোঝা যায় যে জীবের কামনা আছে। জীব যেমন কামনা করে, সেরূপ সংকল্প করে, এবং যেরূপ সংকল্প করে, সেরূপ কর্ম করে এবং যেরূপ কর্ম করে, সেইরূপ ফল সম্পাদন করে।[4]

জীব কর্মফল ভোগ করে

জীবাত্মা দেহের সঙ্গে সঙ্গেই বিনাশপ্রাপ্ত হয় না। জীবাত্মা দেহের বিনাশের পর দেহান্তরে গমন করে। [5]কঠোপনিষদে বলা হয়েছে, 'অর্জিত কর্মফলানুসারে এবং অর্জিত বিজ্ঞান বা চিন্তানুযায়ী কোন কোন জীব শরীর গ্রহণের জন্য মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে।' যারা ইহলোকে শুভকর্মফল অর্জন করে তারা ব্রাহ্মণযোনিতে বা ক্ষত্রিয়যোনিতে বা বৈশ্যযোনিতে জন্মলাভ করে আর যাদের ইহলোকে অর্জিত কর্মফল অশুভ তারা কুক্কুরযোনিতে বা শূকরযোনিতে বা চণ্ডালযোনিতে জন্মগ্রহণ করে।[6] জীব যখন জগৎকর্তা, পরমেশ্বর, পরিপূর্ণ-

জীবাত্মা দেহের বিনাশের পরে দেহান্তরে গমন করে

1. কঠো, ২।২।৫ 2. কঠো, ১।৩।৮-৯ 3. বৃহ, ৩।২।১৩
4. বৃহ, ৪।৪।৫ 5. কঠো, ২।২।৭ 6. ছান্দো, ৫।১০।৭

স্বরূপ ও জগৎকারন ব্রহ্মকে দর্শন করেন তখন তার পাপ-পুণ্য বিনষ্ট হয় এবং তিনি পরম সাম্য প্রাপ্ত হন[1]।

জীবাত্মার চারটি অবস্থা, জাগ্রদবস্থায় তাকে বলা হয় বিশ্ব। জাগ্রদবস্থায় জীব এই বহির্জগতের রূপ রস প্রভৃতি বিষয়গুলি ভোগ করে। জাগ্রদবস্থায় জীব তার জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ প্রভৃতি উনিশটি জ্ঞানোপলব্ধির দ্বার দিয়ে স্থূল বিষয় ভোগ করে। স্বপ্নাবস্থায় আত্মাকে বলা হয় তৈজস। স্বপ্নে কোন বিষয় থাকে না। তখন জীব শুধু বাসনাই (বা সংস্কার) ভোগ করে। জীবের তৃতীয় অবস্থা হল সুষুপ্তি। সুপ্ত ব্যক্তি যে কালে কোন কাম্যবস্তু প্রার্থনা করে না এবং কোনও স্বপ্ন দেখে না তাই সুষুপ্তি। এই সুষুপ্তির অবস্থায় তার নাম হল প্রাজ্ঞ। সুষুপ্তিতে জীবাত্মা স্থিত, সর্ববিক্ষেপরহিত, ; কেবল অনুভূতিস্বরূপ, আনন্দময় এবং আনন্দভোগকারী। গভীর সুষুপ্তির মধ্যে বাসনাদংশনক্ষত জীব কিছুক্ষণের জন্য পরম আনন্দ লাভ করে। চতুর্থ অবস্থা আত্মার তুরীয় অবস্থা। এই অবস্থায় জীব বাহ্যবস্তু বা বাসনা কোনকিছুই ভোগ করেন না। এই অবস্থায় আত্মা প্রজ্ঞ বা প্রাজ্ঞ কোন কিছুই নন্। তিনি অদৃশ্য, অব্যবহার্য্য, অগ্রাহ্য, অননুমেয়, অচিন্ত্য, অনির্দেশ্য। তিনি কেবলই আত্মা, এই প্রতীতিরগম্য। তিনি প্রপঞ্চের বিরামস্বরূপ, শান্ত শিব ও অদ্বিতীয়। তিনিই আত্মা। তিনিই বিজ্ঞেয়। এই আত্মা ব্রহ্ম[2]।

জীবাত্মার চারটি অবস্থা

জীবাত্মা পাঁচটি কোষের সমষ্টি। জীবের দেহ এবং ইন্দ্রিয় হল তার অন্নময় কোষ। অন্নের দ্বারাই জীব জীবনধারণ করে। জীবকে প্রথমে দেহ ও ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অভিন্ন গণ্য করা হয়। অন্নময় কোষের মধ্যে রয়েছে প্রাণময় কোষ। প্রাণের দ্বারা জীব বর্দ্ধিত হয়। জীবকে প্রাণের সঙ্গে অভিন্ন মনে করা হয়। প্রাণময় কোষের মধ্যে রয়েছে মনোময় কোষ, যা মনের উপর নির্ভর। আত্মাকে মন এবং তার ক্রিয়ার সঙ্গে অভিন্ন করে দেখা হয়। মনোময় কোষের মধ্যে রয়েছে বিজ্ঞানময় কোষ। বুদ্ধি এবং তার ক্রিয়ার উপর এই বিজ্ঞানময়

জীবাত্মা পঞ্চকোষের সমষ্টি

1. মুণ্ডকো. ৩।১।৩। 2. মাণ্ডূকো. ২

কোষ নির্ভর। বিজ্ঞানময় কোষের বর্ণনায় তৈত্তীরিয় উপনিষদে বলা হয়েছে, 'শ্রদ্ধা তাঁর মস্তক, ধর্মনিষ্ঠা তার দক্ষিণাঙ্গ, যথার্থ কথন ও আচরণ বামাঙ্গ, ধ্যান (যোগ) এঁর দেহের মধ্যভাগ, শক্তি নিম্নাঙ্গ অর্থাৎ ভিত্তি।[1] এই বিজ্ঞানময় থেকে অতিরিক্ত অথচ তারই অভ্যন্তরে রয়েছে আনন্দময় কোষ। উক্ত আনন্দময়ের দ্বারা এই বিজ্ঞানময় পূর্ণ। আনন্দ বাহ্য-ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বাহ্যবস্তুর সংযোগলাভবশতঃ সুখভোগ নয়। আনন্দ আত্মার কোন কোষ নয়। আনন্দ আত্মার স্বরূপ। আনন্দই ব্রহ্ম। আনন্দ থেকেই ভূতবর্গ জাত হয়, জাত হয়ে আনন্দের দ্বারা বর্ধিত হয়, এবং অবশেষে আনন্দাভিমুখে প্রতিগমন করে ও আনন্দে বিলীন হয়। জীবাত্মা দ্রষ্টা, স্রষ্টা, শ্রোতা, আঘ্রাতা, আস্বাদকর্তা, মননকারী, নিশ্চয়কারী কর্তা ও বিজ্ঞাতৃস্বরূপ পুরুষ। সেই পুরুষ অক্ষয় পরমাত্মায় সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত হন। যে কেহ তমোহীন, উপাধিরহিত, গুণবিবর্জিত, বিশুদ্ধ অক্ষরকে জানেন, তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বস্বরূপ হন।[2]

১০। জীবাত্মা ও পরমাত্মা (The Individual self and the Supreme self):

মুণ্ডকোপনিষদে দুটি পাখীর যে উপমা দেওয়া হয়েছে, সেই উপমার মাধ্যমে জীবাত্মা ও পরমাত্মার পার্থক্য বোঝান হয়েছে।[3] "সর্বদা সম্মিলিত ও পরস্পরের সহচর দুটি পাখী একই বৃক্ষকে আশ্রয় করে আছে, তাদের মধ্যে একটি স্বাদু ফল ভক্ষণ করে, অপরটি ভক্ষণ না করে দর্শন করে। একই বৃক্ষে অবস্থিত একজন জগতের দুঃখে নিমগ্ন হয়ে মোহগ্রস্থ হয়ে দুশ্চিন্তা সহকারে শোক করে। কিন্তু যখন সে বহুজন সেবিত ও দেহ-বিলক্ষণ ঈশ্বরকে এবং তাঁর মহিমাকে (আপনা থেকে অভিন্ন রূপে) দর্শন করে, তখন বীতশোক হয়।" জীব যখন হিরণ্যবর্ণ, জগৎকর্তা, পরমেশ্বর, পরিপূর্ণস্বরূপ ও জগৎকারণ ব্রহ্মকে দর্শন করেন তখন সেই জীব পরম সাম্য প্রাপ্ত হন। [4]কঠোপনিষদে জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে

মুণ্ডকোপনিষদে দুটি পাখীর উপমা

---

1. তৈত্তী, ২।৪ 2. প্রশ্নো, ৪।৯-১০ 3. মুণ্ডকো, ৩।১।১-২ 4. কঠো, ১।৩।১

যথাক্রমে ছায়া এবং আলোকের (আতপের) সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। জীবাত্মা কর্মফল ভোগ করে এবং সুখদুঃখ অনুভব করে, পরমাত্মা সেগুলি ভোগ করে না, নীরব দর্শকের মত সেগুলি প্রত্যক্ষ করে। যখন কর্মফলভোক্তা জীব নিজের মধ্যেই ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করে তখন তার সব ভয় দূরীভূত হয়। সূর্য্য যেরূপ জীবমাত্রের দর্শনের হেতু হয়েও চাক্ষুষ পাপ ও অশুচি-দর্শনাদিরূপ বাহ্যদোষের দ্বারা লিপ্ত হন না, সেইরূপ নিখিল জীবের আত্মা এক হয়েও জাগতিক দুঃখে লিপ্ত হন না; কেননা তিনি তার অতীত।[1]

কঠোপনিষদে জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে ছায়া ও আলোকরূপে বর্ণনা

প্রশ্নোপনিষদে বলা হয়েছে পরমাত্মা থেকেই প্রাণের উদ্ভব হয়। কোন ব্যক্তির সঙ্গে তার ছায়া যেমন সংলগ্ন তেমন প্রাণ অর্থাৎ জীবাত্মা পরমাত্মাতে সংলগ্ন থাকে।[2]

প্রশ্নোপনিষদে জীবাত্মার ও পরমাত্মার সংলগ্নতার কারণ

জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ই অজাত ও অনন্ত। পরমাত্মা সর্বজ্ঞ ও বিভু। জীবাত্মা অল্পজ্ঞ। অবিদ্যার জন্যই জীবাত্মার বন্ধন। সময় সময় জীবাত্মার সংকল্পের কথা বলা হয়েছে, সময় সময় জীবাত্মার সংকল্পের কথা অস্বীকার করা হয়েছে এবং ঈশ্বরের অতিবর্তীতার কথা স্বীকার করা হয়েছে। পরমাত্মাই সর্বকর্মা। যে সব জীবদের এই জগৎ থেকে তিনি মুক্ত করতে চান, তাদের দিয়ে তিনি সাধু কর্ম করান এবং যাদের তিনি অবনত করতে চান তাদের দিয়ে অসাধু কর্ম করান।[3]

[4]পরমাত্মা বাক্য, মন এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর। অদ্বিতীয় জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা সর্বভূতে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত। তিনি সর্বব্যাপী, সর্বভূতের অন্তরস্থিত আত্মা, কর্মাধ্যক্ষ, সর্বভূতের নিবাসস্থান, সর্বদ্রষ্টা, চেতয়িতা, নিরুপাধিক ও নির্গুণ।[5] পরমাত্মা সর্বভূতের অন্তরাত্মাস্বরূপে সকলের নিয়ন্তা।[6] পরমাত্মা নিত্যগণের মধ্যে নিত্য, চেতনগণের মধ্যে চেতন, এক হয়েও তিনি বহু প্রাণীর কাম্যবস্তু বিধান করেন।[7] এই পরমাত্মাকে

1. কঠো, ২।২।১১ 2. প্রশ্নো, ৩।৩ 3. কৌষী, ৩।৮ 4. কঠো, ২।৩।২ 5. শ্বেতা, ৬।১১
6. কঠো, ২।২।১২ 7. কঠো, ২।২।১৩

নিষ্কামব্যক্তিরা অপরোক্ষরূপে অনুভব করেন।[1] পরমাত্মা সর্বব্যাপী এবং অনুমানের হেতু বিবর্জিত।[2] পরমাত্মা অনন্ত ও সর্বস্বরূপ, সেহেতু কর্তৃত্বহীন।[3]

উপনিষদের কোন কোন জায়গায় জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভিন্নতার কথা বলা হলেও উভয়ের অভিন্নতার কথা বহু জায়গায় ব্যক্ত হয়েছে। আত্মাই ব্রহ্ম; 'তত্ত্বমসি', যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রহ্ম হন। বৃহদারণ্যকোপনিষদে বলা হয়েছে এই আত্মাই অজ, অজর, অমর, অমৃত, অভয় ও ব্রহ্ম। অভয়ই ব্রহ্ম। যিনি এরূপ জানেন তিনি অভয় ব্রহ্ম হন.[4] যে জীব ব্রহ্মকে জানেন সে আত্মরতি, আতক্রীড়, আত্মমিথুন, আত্মানন্দ হয়ে বিদ্বান স্বরাট্ হন।[5] জীব যখন ব্রহ্মকে দর্শন করে তখন সেই জ্ঞানী পুরুষ পুণ্য ও পাপাত্মক সমস্ত বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি পান এবং নিলিপ্ত ও নির্মল হয়ে পরম সাম্য প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ সমস্ত ভেদাভেদ তার কাছে লোপ পায়।[6] মুণ্ডকোপনিষদে আরও বলা হয়েছে, বেদান্তজনিত বিজ্ঞানের বিষয় যে পরমাত্মা তাঁকে যাঁরা সুনিশ্চিতভাবে জেনেছেন, সন্ন্যাসযোগাবলম্বনে যাঁদের অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হয়েছে এই রকম প্রযত্নশীল সাধকগণ জীবিতাবস্থায় পরমাত্মার সঙ্গে একীভূত হয়ে দেহপরিত্যাগকালে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে ব্রহ্মে স্থিতিলাভ করেন।[7] প্রবহমান নদী সকল যেমন নিজ নিজ বিশিষ্ট নাম ও রূপ পরিত্যাগ করে সমুদ্রের সঙ্গে একতা প্রাপ্ত হয়, সেরূপ ব্রহ্মবিদ্ জ্ঞানী পুরুষ নিজের বিশিষ্ট নাম-রূপ থেকে বিমুক্ত হয়ে অব্যাকৃত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্বপ্রকাশ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন।[8] অক্ষর ব্রহ্ম অদৃষ্ট হলেও দ্রষ্টা, অশ্রুত হলেও শ্রোতা, মননের অবিষয় হলেও মন্তা, অবিজ্ঞাত হলেও বিজ্ঞাতা। তার থেকে ভিন্ন কোন দ্রষ্টা নেই, তার থেকে ভিন্ন কোন শ্রোতা নেই, তার থেকে ভিন্ন কোন মন্তা নেই। তার থেকে ভিন্ন কোনও বিজ্ঞাতা নেই। অন্তর্যামী ও অমৃত ইনিই আপনার আত্মা।[9] এখানে কোন ভেদ নেই। যিনি এতে ভেদ প্রত্যক্ষ করেন তিনি মৃত্যুর পর মৃত্যুকে পান।[10] যখন অবিদ্যাকল্পিত দেহেন্দ্রিয়াদি-সমষ্টি-রূপ উপাধি থেকে সম্ভূত ব্যষ্টিভাব হয়, তখন ব্রহ্মে

1. কঠো, ১।২।১৪ 2. কঠো, ২।৩।৮ 3. শ্বেতা, ১।৯ 4. বৃহ, ৪।৪।২৫
5. ছান্দো, ৭:২৫।১ 6. মুণ্ডক, ৩।১।৩ 7. মুণ্ডক. ৩।২।৬ 8. মুণ্ডক, ৩।২।৮
9. বৃহ, ৩।৮।১১, ৩।৭।২৩ 10. বৃহ, ৪।৪।১৯

দ্বৈতপ্রায় হয়ে থাকে। তখন একে অপরকে আঘ্রাণ করে, একে অপরকে দর্শন করে, একে অপরকে শ্রবণ করে, একে অপর বিষয় বলে, একে অপর বিষয় চিন্তা করে, একে অপর বিষয় জানে। কিন্তু যখন সমস্ত এঁর আত্মাই হয়ে গেল, তখন কিসের দ্বারা কি জানবে?[1] তাঁর থেকে পৃথক আকারে বিভক্ত দ্বিতীয় বস্তু থাকে না, যা তিনি জানবেন।[2] উপনিষদের উপরিউক্ত বক্তব্য থেকে একথাই স্পষ্ট হয়ে উঠে যে জ্ঞাতা জ্ঞেয়ের দ্বৈত, জীবাত্মা পরমাত্মার ভিন্নতা, আত্মার বহুত্ব প্রভৃতি অবভাস মাত্র। [3]বৃহদারণ্যকোপনিষদে স্পষ্টই বলা হয়েছে, "এই যে আত্মা বুদ্ধিতে উপহিত ও ইন্দ্রিয়বর্গের মধ্যে অবস্থিত আছেন, তিনি এই মহান ও জন্মরহিত পরমাত্মাই।"

১১। ব্রহ্ম (Brahman) ঃ

পরমতত্ত্বকে দুদিক থেকে প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে। বস্তুগত দিক থেকে, মনোগত দিক থেকে। বস্তুগত দিক থেকে যখন দেখা হয় তখন পরমতত্ত্বকে ব্রহ্ম বলা হয়। ব্রহ্ম শব্দ 'বৃহ' ধাতু থেকে উৎপন্ন, যার অর্থ হল বর্ধিত হওয়া বা বিবর্তিত হওয়া। আদিতে

ব্রহ্ম শব্দের অর্থ

ব্রহ্ম বোঝাত যজ্ঞকে, তারপর প্রার্থনাকে, এবং তারপর বর্তমান অর্থ পরমতত্ত্বকে, যা জগতরূপে বিবর্তিত হয়। ব্রহ্ম হল তাই যা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকৃতি এবং আত্মাতে রূপ গ্রহণ করে। ব্রহ্মই এই জগতের মূল কারণ। [4]ছান্দোগ্যোপনিষদে ব্রহ্মকে [5]'তজ্জলান্' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। —ব্রহ্ম হল সেই যার থেকে এই জগৎ জাত হয়, যাতে লীন হয় ও যাতে জীবিত থাকে। তৈত্তিরীয়োপনিষদে

ব্রহ্ম থেকেই জগৎ জাত হয

বলা হয়েছে, 'যা থেকে এই অখিল ভূতবর্গ উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হয়ে যার দ্বারা বর্ধিত হয় এবং বিনাশকালে যাতে গমন করে ও যাতে বিলীন হয়, তিনিই ব্রহ্ম'। ব্রহ্ম থেকে বিভিন্ন ভূতের

---

1. বৃহ, ২।৪।১৪ 2. বৃহ, ৪।৩।৩০ ; ৪।৩।৩১ 3. বৃহ, ৪।৩।২২ 4. ছান্দোগ্য, ৩।১৪

5. "তজ্জলান্=তজ্জম্+তল্লম্+তদনম্। 'জন্' ধাতুর অর্থ জাত হওয়া, লী-র অর্থ লয় হওয়া এবং 'অন্' এর অর্থ জীবন ধারণ করা।

উৎপত্তি নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ব্রহ্ম থেকে আকাশের উৎপত্তি, আকাশ থেকে বায়ু, বায়ু থেকে অগ্নি, অগ্নি থেকে জল, জল থেকে পৃথিবী, পৃথিবী থেকে ওষধিসকল, ওষধিসকল থেকে অন্ন এবং অন্ন থেকে পুরুষ, অর্থাৎ মানুষের উৎপত্তি।[1] কিন্তু বিবর্তন সম্পর্কীয় যথাযথ মতবাদটি পাওয়া যায় তৈত্তিরীয় উপনিষদের পঞ্চকোষ মতবাদে। নিম্নতম স্তর হল অন্নময় কোষ। জীব অন্ন থেকে জাত হয়, অন্নের দ্বারা জীবনধারণ করে এবং জীবনশেষে অন্নে লীন হয়। কিন্তু অন্ন বা জড় অচেতন : প্রাণের ব্যাখ্যা তার থেকে পাওয়া যায় না। ব্রহ্ম শুধুমাত্র জড়ের উৎপত্তিতেই তৃপ্ত হতে পারেন না। জড়ের উদ্দেশ্য তখনই পূর্ণ হয় যখন প্রাণের উৎপত্তি হয়। কিন্তু প্রাণের লক্ষ্য তখনই পরিপূর্ণ হয় যখন মনের উৎপত্তি হয়। তাই আমরা পাই মনোময় কোষ। কিন্তু মন বা প্রত্যক্ষগ্রাহ্য চেতনা মানুষ ও পশু উভয়ের মধ্যে বর্তমান। এই চেতনা পশুর মধ্যে রয়েছে সহজাত প্রবৃত্তি ও পরাবর্তক ক্রিয়ার স্তরে। কিন্তু মানুষ শুধু চেতন নয়, আত্মসচেতন। তাই বিবর্তনের চতুর্থ স্তরে আমরা পাই বিজ্ঞানময় কোষ। মানুষই কেবল মাত্র এই বিজ্ঞানের অধিকারী। কিন্তু এও যথেষ্ট নয়। এর পরেও এক উচ্চতর অভিজ্ঞতা আছে, যার নঞর্থক আভাস এই ব্যবহারিক জীবনে আমরা লাভ করি, এবং যাকে বুদ্ধি দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। এই স্তর হল আনন্দের স্তর যেখানে জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, আত্মা, অনাত্মার কোন ভেদ নেই। জ্ঞান, জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়, এই তিন এক অতীন্দ্রিয় ঐক্যের মধ্যে মিলিয়ে যায়। ব্রহ্ম, যা পরমতত্ত্ব, সকলকিছুর আশ্রয় হয়েও, সকল কিছুর উর্দ্ধে। কোন কিছুই হারিয়ে যায় না, যা নিম্ন তাই উচ্চতরে উন্নীত হয়। জড় প্রাণে, প্রাণ মনে, মন বিজ্ঞানে, বিজ্ঞান আনন্দে হারিয়ে যায় না। সব কিছু জুড়ে ব্রহ্মের অস্তিত্ব। ব্রহ্ম হলেন অন্তর্যামী এবং সর্বভূতান্তরাত্মা। রথচক্রের নাভিতে এবং নেমিতে যেমন সব চক্রশলাকাই সন্নিবিষ্ট থাকে ঠিক তেমনি সকল প্রাণী, সকল দেবতা,

ব্রহ্ম থেকে ভূতের উৎপত্তির ক্রম

ব্রহ্ম অন্তর্যামী এবং সর্বভূতান্তরাত্মা

1. তৈত্তিরীয় ২।১।৩

সকল লোক, সকল ইন্দ্রিয় এবং সমস্ত জীবাত্মা এই পরমাত্মাতে সমর্পিত রয়েছে।

[1]কঠোপনিষদে বলা হয়েছে 'এই যা কিছু চরাচর বস্তু দৃষ্ট হয়, পরব্রহ্ম আছেন বলেই সেই সমস্ত তাঁর থেকে নিঃসৃত হয়ে স্পন্দিত হচ্ছে। সেই ব্রহ্ম উদ্যত বজ্রসদৃশ অতি ভয়ানক। যাঁরা এই ব্রহ্মকে জানেন তাঁরা অমর হন।'

যে তত্ত্বকে বস্তুগত দিক থেকে ব্রহ্ম বলা হয়, সই তত্ত্বকেই মনোগত দিক থেকে আত্মা বলা হয়। ব্রহ্ম ও আত্মা সমার্থক। [2]বৃহদারণ্যকোপনিষদে বলা হয়েছে, 'এই সমস্তই আত্মা। এই আত্মজ্ঞান অমৃত। ইনি ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মজ্ঞানই সব।'[3] ঐ উপনিষদে অন্যত্র বলা হয়েছে 'এই সর্বানুভবকারী আত্মা ব্রহ্মই। এই হল সব বেদান্তের উপদেশ।' যিনি সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম, তিনিই সর্বান্তর আত্মা।[4] [5]বৃহদারণ্যকোপনিষদের অন্যত্র বলা হয়েছে, 'যিনি আত্মা, তিনি অবশ্যই ব্রহ্ম,—তিনিই বিজ্ঞানময়, মনোময়, প্রাণময়, চক্ষুময়, শ্রোত্রময়, পৃথিবীময়, আপোময়, বায়ুময়, আকাশময়, তেজোময়, অতেজোময়, কামময়, অকামময়, ক্রোধময়, অক্রোধময়, ধর্মময়, অধর্মময়, সর্বময়।'[6] অন্যত্র বলা হয়েছে, 'এই আত্মাই অজ, অজর, অমর, অমৃত, অভয় ও ব্রহ্ম। অভয়ই ব্রহ্ম। যিনি এইরূপ জানেন তিনি অভয় ব্রহ্ম হন।' [7]কঠোপনিষদে বলা হয়েছে, 'ব্রহ্মের জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, এই আত্মা কারণান্তর থেকে উদ্ভূত হয় নি। ব্রহ্ম থেকেও কিছু উৎপন্ন হয় নি। এই আত্মা জন্মহীন, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ। শরীর নিহত হলেও তাঁর নাশ হয় না।' [8]ছান্দোগ্যোপনিষদে বলা হয়েছে 'যিনি সর্বকর্মা. সর্বকাম, সর্বগন্ধ, সর্বরস, সব কিছু ব্যাপ্ত হয়ে বিদ্যমান, তিনি ইন্দ্রিয়শূন্য ও আগ্রহবিবর্জিত। ইনিই হৃদয়পদ্ম মধ্যে অবস্থিত আমার আত্মা। ইনি ব্রহ্ম।' ঐ উপনিষদের [9]অন্যত্র বলা হয়েছে, 'অক্ষিগোলকে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হন, ইনিই আত্মা। ইনি অমর ও ভয়াতীত। ইনি ব্রহ্ম।' ঐ উপনিষদেরই [10]অন্যত্র বলা হয়েছে, "এই আত্মাই অমৃত ও অভয়; ইনিই ব্রহ্ম।" উপনিষদের

---

1 কঠো. ২।৩।২ 2. বৃহদা, ২।৫।২-৩, 3. বৃহদা. ২।৫।১৯ 4. বৃহদা. ৩।৫।১
5. বৃহদা, ৪।৪।৫ 6. বৃহদা. ৪।৪।২৫ 7. কঠো ১।২।১৮ 8. ছান্দোগ্য ৩।১৪।৪
9 ছান্দোগ্য ৪।১৫।১ 10. ছান্দোগ্য ৮।৭।৪

মহাবাক্য, 'তত্ত্বমসি', 'তুমিই সেই' ; 'আত্মাই ব্রহ্ম', আত্মা ও ব্রহ্মের অভিন্নতার কথাই ব্যক্ত করে। ব্রহ্ম উপাদান কারণ, আকার কারণ, নিমিত্ত কারণ ও পরিণাম কারণ। বিশ্বের মূলতত্ত্ব হল ব্রহ্ম। 'তাঁর উপাদান বিভিন্ন রূপে প্রকট হয়ে নামের দ্বারা চিহ্নিত হয়ে বহুরূপে প্রকাশ পেয়েছে।[1] যেমন একটি মৃত্তিকাপিণ্ডের দ্বারা মৃত্তিকার পরিণামভূত সবই জানা যেতে পারে, তেমনি ব্রহ্মের দ্বারা ব্রহ্মের পরিণামভূত সবই জানা যেতে পারে। ব্রহ্ম যেমন উপাদান কারণ, তেমনি পরিণাম কারণ (final cause)। [2]কঠ উপনিষদে বলা হয়েছে 'একং রূপং বহুধা যঃ করোতি'। ব্রহ্ম এক রূপকে বহুরূপে প্রকাশ করেছেন। কঠ উপনিষদের অন্যত্র বলা হয়েছে, [3]একই অগ্নি যেমন জগতে প্রবিষ্ট হয়ে রূপে রূপে প্রতিরূপ হয়েছেন, সেরূপ এক সর্বভূতের অন্তরাত্মা রূপে রূপে প্রতিরূপ হয়েছেন এবং তাদের দ্বারা অস্পৃষ্ট হয়ে তদতিরিক্তরূপে বর্তমান রয়েছেন। ব্রহ্ম নিমিত্ত কারণ। (efficient cause) ব্রহ্ম বিশ্বের অভ্যন্তরে অবস্থান করে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করেন। [4]বৃহদারণ্যকোপনিষদে বলা হয়েছে যে ব্রহ্ম সর্বভূতের অন্তরে থেকে তাদের নিয়ন্ত্রিত করেন। সর্বভূত তাঁর শরীরস্বরূপ। ব্রহ্ম পরিণাম কারণ (final cause)। ব্রহ্ম রসস্বরূপ। জীব সেই রসকে লাভ করেই আনন্দিত হয়।[5] তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে, সৃষ্টির পূর্বে এই নামরূপে অভিব্যক্ত জগৎ অব্যাকৃত ব্রহ্মরূপেই ছিল। সেই অসৎ-শব্দবাচ্য ব্রহ্ম থেকে এই নামরূপে অভিব্যক্ত জগৎ উৎপন্ন হল। তিনি নিজেই আপনাকে এরূপ করলেন, এই কারণে তাঁকে স্বয়ংকর্তা বলা হয়। যিনি স্বয়ং-কর্তা, তিনিই রসস্বরূপ। জীব এই রসকে লাভ করেই আনন্দিত হয়।

নির্গুণ ব্রহ্ম : উপনিষদে পরব্রহ্ম এবং অপরব্রহ্মের উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। পরব্রহ্ম নির্বিশেষ, অনৌপাধিক এবং নির্গুণ। অপরব্রহ্ম হল সবিশেষ, সোপাধিক এবং সগুণ। পরব্রহ্ম হল অবিশেষিত এবং দুর্জ্ঞেয়, অপর-

---

1. 'বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্'—ছান্দোগ্য ৬।১।৪ 2. কঠ, ২।২।১২
3. কঠো, ২।২।৯ 4. বৃহদা, ৩।৭।১৫ 5. "যদ্বৈ তৎ সুকৃতম্। রস বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।—তৈত্তিরীয়োপনিষদ। ২।৭

ব্রহ্ম হল বিশেষিত এবং জ্ঞেয়। পরব্রহ্ম হল নিষ্প্রপঞ্চ, অপরব্রহ্ম হল সপ্রপঞ্চ,। পরব্রহ্ম হল অ-দৈশিক, অ-কালিক, অকারণ এবং জগদরহিত। অপরব্রহ্ম দৈশিক, কালিক এবং জগতের প্রভু। পরব্রহ্ম সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ। অপরব্রহ্ম অনাদি, অনন্ত সর্বব্যাপক, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান; জগতের স্রষ্টা, পালক ও সংহারক। অপর-ব্রহ্ম নৈতিক, নিয়ামক এবং কর্মফলদাতা। তিনি জীব ও জগতের মধ্যে তাদের অন্তর্যামী রূপে অন্তঃস্থত। জ্ঞাতা ও নিয়ামক রূপে তিনি তাদের অতিবর্তী। জীব ও জগৎ সম্পর্কে তিনি অতিবর্তী ও অন্তর্বর্তী উভয়ই। তিনি জগতের ঈশ্বর ও প্রভু। পরাবিদ্যার লক্ষ্য হল পরব্রহ্ম, অপরাবিদ্যার লক্ষ্য হল ঈশ্বর। পরব্রহ্ম হল পরমাত্মা, শুদ্ধ চেতনা। পরব্রহ্ম পরমতত্ত্ব। পরব্রহ্ম এবং অপরব্রহ্ম একই ব্রহ্মের দুটি দিক।

পরব্রহ্ম এবং অপরব্রহ্মে ভেদ

[1]প্রশ্নোপনিষদে বলা হয়েছে যে ব্রহ্মই পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্ম। [2]বৃহদারণ্য-কোপনিষদে বলা হয়েছে যে ব্রহ্মের দুটি মাত্র রূপ আছে—মূর্ত ও অমূর্ত, মর ও অমর, পরিচ্ছিন্ন ও অপরিচ্ছিন্ন, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ[3]। তৈত্তিরীয়পোনিষদে বলা হয়েছে, 'ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করলেন এবং তার মধ্যে প্রবেশ করে মূর্ত ও অমূর্ত, পরিচ্ছিন্ন ও অপরিচ্ছিন্ন, আশ্রয়স্বরূপ ও অনাশ্রয়স্বরূপ, চেতন ও জড়, এবং সত্য ও মিথ্যা—এই যা কিছু সব হলেন। পরব্রহ্মকে নেতি নেতি ভাবেও বর্ণনা করা হয়েছে। অপরব্রহ্মকে সদর্থকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। পরব্রহ্মকে ক্লীবলিঙ্গরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। পরব্রহ্ম নৈর্ব্যক্তিক। তিনি নিখিল ইন্দ্রিয়ের গুণবিশিষ্টরূপে প্রতিভাত হন, অথচ তিনি সমুদয় ইন্দ্রিয় ব্যাপার-শূণ্য। তিনি সকলেরই শক্তিশালী নিয়ন্তা, সকলের আশ্রয় এবং পরম কারণ।[4] পরব্রহ্ম এক। তিনি নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, নিরবোধ্য এবং নিরঞ্জন। তিনি শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধবিহীন।[5] তিনি অক্ষয়, শাশ্বত, অনাদি ও অনন্ত।[6] তিনি আলোহিত, অস্নেহ, অচ্ছায়া, অতামস,

পরব্রহ্মের পরিচয়

1. প্রশ্নো, ৫।২ 2. বৃহদা, ২।৩।১ 3. তৈত্তি, ২।৬ 4. শ্বেতা, ৩।১৭
5. কঠো, ১।৩।১৫ 6. কঠো, ১।৩।১৫

অবায়ু, অনাকাশ, অতেজস্ক। তিনি জড় বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণ নয়, তিনি অচক্ষুষ, অশোত্র, অপানিপাদ, অপ্রাণ, অবাক, অমুখ এবং অমানস। তিনি অগোত্র এবং অবর্ণ। [1]মুণ্ডকোপনিষদে বলা হয়েছে, "তিনি অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, নিষ্কারণ, অরূপ ও চক্ষুকর্ণাদিশূন্য, হস্তপাদহীন, অবিনাশী, বিবিধাকার, সর্বব্যাপী ও সুসূক্ষ্ম।' পরব্রহ্ম পুরুষও নয়, অপুরুষও নয়। তিনি চক্ষু ছাড়াই দেখেন, কর্ণ ছাড়াই শোনেন, পদ ছাড়াও ভ্রমণ করেন এবং হস্ত ছাড়াও গ্রহণ করেন। তিনি ইন্দ্রিয়াদিশূন্য, তবু ইন্দ্রিয়ের শক্তিবিশিষ্ট।

পরব্রহ্ম জন্মহীন, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ। ইনি অব্যয়, অনাদি, অনন্ত, বিভু, সর্বগত এবং অমূর্ত। ইনি শুক্র, আত্ম-উজ্জ্বল, সনাতন এবং অক্ষর। পরব্রহ্ম অদৃশ্য, অব্যবহার্য, অগ্রাহ্য, অননুমেয়, অচিন্ত্য, অনির্দেশ্য, প্রপঞ্চের বিরামস্বরূপ, শান্ত, শিব ও অদ্বিতীয়।[2] বৃহদারণ্যকোপনিষদে[3] বলা হয়েছে ইনি অস্থূল, অনণু, অহ্রস্ব, অদীর্ঘ, আলোহিত, অস্নেহ অচ্ছায়, অতমঃ, অবায়ু, অনাকাশ, অসঙ্গ, অরস, অগন্ধ, অচক্ষুষ্ক, অশ্রোত্র, অবাক্, অমনঃ অতেজস্ক, অপ্রাণ, অমুখ, অমাত্র, অনন্তর ও অবাহ্য। ইনি সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর এবং বিশাল থেকে বিশালতর।[4] ইনি বৃহৎ, দিব্য এবং অচিন্ত্যস্বরূপ।[5] ইনি অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, নিষ্কারণ, অরূপ ও চক্ষুকর্ণাদিশূণ্য। ইনি হস্তপাদহীন, অবিনাশী, সর্বব্যাপী ও সুসূক্ষ্ম। ইনি অব্যয় অর্থাৎ ভূতবর্গের কারণ।

পরব্রহ্ম আদি ও অন্তবিহীন। ইনি ধর্ম থেকে ভিন্ন, অধর্ম থেকে ভিন্ন। ইনি কার্য্যকারণ থেকে পৃথক এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান থেকেও ভিন্ন, কিন্তু তিনি কালত্রয়ের নিয়ন্তা।[6] এই ব্রহ্ম অপূর্ব, অনপর, অনন্তর ও অবাহ্য।[7] পরব্রহ্মই আত্মা, এই আত্মা অন্তর্বহিঃশূণ্য ও সর্বাংশেই প্রজ্ঞানঘন।[8] পরব্রহ্ম কালাতীত এবং দেশাতীত।

পরব্রহ্মই আত্মা

পরব্রহ্ম স্বয়ম্ভূ, অজ, অমর, অক্ষর এবং অমৃত। ইনি অনাদি ও অনন্ত, [9]এই ব্রহ্ম অচল, সর্বদা একরূপ এবং মন থেকেও অধিকতর বেগবান। ইনি

1. মুণ্ডকো, ১।১।৬ 2. মাণ্ডুক্যো, ১।৭ 3. বৃহদা, ৩,৮।৮ 4. কঠো, ১।২।২০
5. মুণ্ড, ৩।১।৭ 6. কঠো, ২।১।১২ 7. বৃহদা, ২।৫।১৯ 8. বৃহ, ৪।৫।১৩ 9. ঈশো, ৪,৫

স্থির থেকেও দ্রুতগামী। অপর সকলকে ইনি অতিক্রম করে যান। পরব্রহ্ম অসঙ্গ, শুদ্ধ, নিরঞ্জন, অপাপবিদ্ধ এবং বিরাজ। পরব্রহ্ম পাপ পুণ্যের অতীত। তিনি সর্বব্যাপী, জ্যোতির্ময়, অশরীর, অক্ষত, শিরাহীন, নির্মল, অপাপবিদ্ধ, সর্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা, সর্বোত্তম ও স্বয়ম্ভূ। ব্যবহারিক গুণ পরব্রহ্মে আরোপ করা চলে না। পরব্রহ্ম হল আত্মা, সাক্ষী, দ্রষ্টা এবং বিজ্ঞাতৃ। নয়ন ব্রহ্মকে প্রকাশ করে না, বাক্য দ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায় না, মনের দ্বারাও নয়। সুতরাং ব্রহ্ম অপরের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হতে পারে না। বিজ্ঞাতাকে কিসের দ্বারা জানা যাবে ?[1]

[2]তৈত্তিরীয়োপনিষদে বলা হয়েছে পরব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ। এই সর্বানুভবকারী আত্মা ব্রহ্ম।[3] ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ ও সর্ববিদ এবং সর্বজ্ঞত্বই তাঁর তপস্যা।[4] ইনি সর্বেশ্বর, ইনি সর্বজ্ঞ, ইনি অন্তর্যামী।[5] ব্রহ্ম থেকে পৃথগাকারে বিভক্ত কোন দ্বিতীয় বস্তু থাকে না যাকে ব্রহ্ম জানবেন। [7]বৃহদারণ্যকোপনিষদে বলা হয়েছে, 'তিনি অদৃষ্ট হলেও দ্রষ্টা, অশ্রুত হলেও শ্রোতা। মননের অবিষয় হলেও মন্তা, অবিজ্ঞাত হলেও বিজ্ঞাতা। তাঁর থেকে ভিন্ন কোন দ্রষ্টা নেই, তাঁর থেকে ভিন্ন কোন শ্রোতা নেই, তাঁর থেকে ভিন্ন মন্তা নেই, তাঁর থেকে ভিন্ন বিজ্ঞাতা নেই। অন্তর্যামী ও অমৃত ইনিই আত্মা, এর থেকে যা কিছু ভিন্ন তা বিনাশী। [8]ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান, অনন্তস্বরূপ, ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ। যিনি স্বয়ং-কর্তা, তিনিই রসস্বরূপ।[9] ব্রহ্ম দর্শনাতীত, অশরীর, অনির্বাচ্য নিরাধার[10]। আনন্দই ব্রহ্ম, আনন্দ থেকেই এই ভূতবর্গ জাত হয়, জাত হয়ে আনন্দের দ্বারা বর্ধিত হয় এবং অবশেষে আনন্দাভিমুখে প্রতিগমন করেও আনন্দে বিলীন হয়।[11]

পরব্রহ্ম নির্বিশেষ

পরব্রহ্ম নির্বিশেষ, এবং অনৌপাধিক এবং নির্গুণ। পরব্রহ্ম শুদ্ধ চেতনা, পরব্রহ্ম বিষয় বিষয়ী ভেদশূণ্য, পরব্রহ্ম স্বপ্রকাশ, পরব্রহ্ম আলোকের আলোক। জগৎ এই চেতনার আলোকে আলোকিত হয়। পরম ব্রহ্ম সত্যের সত্য।[12] ব্রহ্ম মূর্ত ও অমূর্ত, যা কিছু

1. বৃহদা, ২।৪।১৪ 2. তৈত্তিরী ২।১।১ 3. বৃহ, ২।৫।১৯ 4. মুণ্ডকো, ১।১।৯, ২।২।৭
5. মাণ্ডূক্যো, ১।৭ 6 বৃহদা, ৪।৩।৩০ 7. বৃহ, ৩।৭।২৩ 8. তৈত্ত, ২।১।১ 9. তৈত্তি, ২।৭
10. তৈত্তি, ২।৭ 11. তৈত্তি, ৩।৬ 12. বৃহদা, ২।৩।৬

অমৃত তাও[1] ইনি। ব্রহ্ম স্থূল ও সূক্ষ্মরূপে বর্তমান ; সকলের প্রার্থনীয়, সর্বদোষ-শূণ্য এবং প্রাণিবর্গের জ্ঞানের অতীত।[2]

[3]কঠোপনিষদে বলা হয়েছে আত্মা উপবিষ্ট থেকেও দূরে গমন করেন, শয়ান থেকেও সর্বত্র বিচরণ করেন। গতি নির্বিশেষ ব্রহ্মকে প্রভাবিত করতে পারে না। কেননা পরব্রহ্ম অপরিণামী ও অচল। [4]ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে, 'সমস্ত বিকারই বাগবলম্বনে অবস্থিত নামমাত্র (স্যাদ্ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং। ব্রহ্ম অনন্ত, নির্বিকার এবং গতিহীন। কাজেই পরিণাম ব্রহ্মকে স্পর্শ করতে পারে না।

পরব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়

পরব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়। পরব্রহ্ম এক, অবিভাজ্য অংশহীন এবং দ্বৈত ও বহুত্ব বর্জিত। পরব্রহ্ম পরমতত্ত্ব। পরব্রহ্ম থেকে বৃহৎ বা বড় কিছু নেই। পরব্রহ্ম ছাড়া অন্য কিছু নেই। ভেদ, দ্বৈত, বহুত্ব এগুলি অবভাস, তাদের ব্যবহারিক সত্যতা আছে, পারমার্থিক সত্যতা নেই। নির্বিশেষ পরব্রহ্ম এক ও অদ্বৈত। [5]শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে বলা হয়েছে, "পরব্রহ্ম থেকে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট অন্য কিছুই নেই, তার থেকে অনুতর বা মহত্তর কেহই নেই।' যখন অবিদ্যাকল্পিত দেহ ইন্দ্রিয়াদি-সমষ্টি রূপ উপাধি থেকে সম্ভূত ব্যষ্টিভাব হয়, তখন পরমার্থ অদ্বৈত ব্রহ্মে দ্বৈতপ্রায় হয়। (যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি)।

পরব্রহ্ম হল ভূমা, ভূমার মধ্যে বিষয় বিষয়ীর কোন দ্বৈত নেই। [6]বৃহদারণ্যকোপনিষদে বলা হয়েছে, এতে (ব্রহ্মে) কোন ভেদ নেই, যিনি এতে ভেদপ্রায় কিছু দেখেন, তিনি পুনপুনঃ মৃত্যুর অধীন হন।

সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর: পরব্রহ্ম নির্বিশেষ অদ্বৈত সত্তা। অপরব্রহ্ম হল সবিশেষ বা ঈশ্বর যিনি এই ব্যবহারিক জীব জগতের সঙ্গে যুক্ত। দৈশিক ও কালিক জগতের সঙ্গে যুক্ত যে অদ্বৈত সত্তা তিনিই ঈশ্বর।

---

1. প্রশ্নো, ২।৫
2. মুণ্ডকো, ২।২।২
3. কঠো. ১।২।২২
4. ছান্দোগ্য, ৬।১।৪-৬
5. শ্বেতা, ৩।৯
6. বৃহদা, ৪।৪।২০

সপ্রপঞ্চ ব্রহ্ম হল সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান। তিনি জগতের স্রষ্টা, পালক ও সংহারক। তিনি এই জগতের ও জীবের অন্তর্যামী, কর্ম নিয়মের নিয়ন্ত্রা, নৈতিক শাসনকর্তা এবং জগতের সংগতিবিধান কর্তা। তিনি অসৎ গুণের নয়, সংগুণের অধিকারী। তিনি শুদ্ধ, অপাপী, অকলঙ্কিত এবং পবিত্র।

অপরব্রহ্মই ঈশ্বর

ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা, পালক এবং সংহারক [1]ছান্দোগ্যোপনিষদে বলা হয়েছে, 'এই সমস্ত জগৎ স্বরূপতঃ ব্রহ্মই, কারণ তাঁর থেকেই জাত হয়, তাঁতে লীন হয় এবং তাঁতে জীবিত থাকে।' তিনি ভূতযোনি, ব্রহ্মযোনি, জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। মুণ্ডকোপনিষদে ব্রহ্মকে ভূতবর্গের কারণরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।[2] ঐ উপনিষদেই বলা হয়েছে, সৃষ্টি-বিষয়ক জ্ঞানবিশিষ্ট হয়ে ব্রহ্ম স্ফীত হন। তাঁর থেকে অব্যাকৃত প্রকৃতি জাত হয়, প্রকৃতি থেকে হিরণ্যগর্ভ, হিরণ্যগর্ভ থেকে মন, মন থেকে পঞ্চভূত, এবং তার থেকে ক্রমশঃ লোকসমূহ (কর্ম) এবং কর্ম থেকে কর্মফল উৎপন্ন হয়। ব্রহ্ম থেকেই হিরণ্যগর্ভ, নাম, রূপ ও অন্ন জাত হয়। ঐ উপনিষদে আরও বলা হয়েছে যে এই পুরুষ থেকে প্রাণ জাত হয় এবং মন সর্বেন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও সকলের আধারভূতা ক্ষিতি সম্ভূত হয়।[3] এই পুরুষ থেকে সমুদয় সমুদ্র ও পর্বত সম্ভূত হয়। এর থেকে বহুরূপ নদীসমূহ প্রবাহিত হয়। এর থেকেই সমুদয় ওষধি জাত হয়।[4]

ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা, পালক এবং সংহারক

ছান্দোগ্যোতে বলা হয়েছে যিনি আকাশ এই নামে প্রসিদ্ধ, তিনিই নাম ও রূপকে ব্যাকৃত করেন। উক্ত নাম ও রূপ যাঁর মধ্যে তিনিই ব্রহ্ম। তিনিই অমৃত, তিনিই আত্মা। উপনিষদ অবভাস অর্থে নামরূপ শব্দ ব্যবহার করেনি। বিচিত্র সবিশেষে বস্তুকে বোঝাবার জন্য ঐ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

ব্রহ্মই আত্মা

জগৎ ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট। যেমন সুদীপ্ত অগ্নি থেকে অগ্নির সজাতীয় সহস্র

1. ছান্দোগ্যো. ৩।১৪।১ 2. মুণ্ডকো, ১।১।৬ 3. মুণ্ডকো, ২।১।৩

4. মুণ্ডকো, ২।১।৯

সহস্র অগ্নিকণা নির্গত হয়, তেমনি ব্রহ্ম থেকে নানাবিধ জীব উদ্ভূত হয় এবং তাতেই বিলীন হয়।[1] ব্রহ্মের জগদ্ব্যাপী মহিমা[2]। ঈশোপনিষদে বলা হয়েছে ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু অনিত্য বস্তু আছে, এ সমস্তই পরমেশ্বরের দ্বারা আবরনীয়।[3] [4]ছান্দোগ্যোপনিষদে বলা হয়েছে, চরাচর এই সমস্তই সৎ থেকে উৎপন্ন, সতে আশ্রিত ও সতে বিলীন হয়। জগৎ সৎ। জগৎ ব্রহ্মের প্রকাশ। প্রকাশ দু'প্রকার—স্থূল ও সূক্ষ্ম, আকার ও আকারহীন। সব স্থূল ও সূক্ষ্ম বস্তু ব্রহ্মের প্রকাশ। জগৎ ঈশ্বরের প্রকাশ। এ জগৎ যেন ঈশ্বরের হরিদ্রারঞ্জিত বস্ত্রের মতন। এ সবই ব্রহ্ম। এই সব আত্মা ছাড়া কিছু নয়। ব্রহ্ম জগতের স্রষ্টা, সকল কিছুর নির্মাতা, এ সমস্ত জগৎ স্বরূপতঃ ব্রহ্ম। এই সব থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে জগৎ সৎ. জগৎ অবভাস নয় এবং ব্রহ্ম বহির্ভূত জগতের অস্তিত্ব নেই।

জগৎ ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট

ঈশ্বর জগতের শাসনকর্তা ও নিয়ামক। [5]ঈশ্বর বিশ্বের কর্তা কারণ ঈশ্বর সকলের কর্তা। সকলেই তাঁর আত্মা এবং তিনিই সকলের আত্মা। এই ঈশ্বরের প্রশাসনে সূর্য্য ও চন্দ্র, দ্যুলোক ও ভূলোক, নিমেষ, মুহূর্ত, দিবারাত্র, পক্ষ, মাস, ঋতু ও সম্বৎসর—এইসব বিধৃত হয়ে অবস্থান করছে। [6]বৃহদারণ্যকোপনিষদে বলা হয়েছে, 'তিনি সকলের ঈশ্বর, সকলের অধিপতি, এই জগতে যা কিছু আছে তিনি সেই সমস্তকেই শাসন করেন।' [7]তৈত্তিরীয়োপনিষদে বলা হয়েছে, ঐ ব্রহ্মেরই ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়। ভয়ে সূর্য্য উদিত হয়। এঁরই ভয়ে অগ্নি ও ইন্দ্র এবং পঞ্চম স্থানীয় যম স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। [8]কঠোপনিষদে বলা হয়েছে, 'এই পরমেশ্বরের ভয়ে অগ্নি তাপ দেন, ভয়ে সূর্য্য কিরণ বিকিরণ করেন।' [9]ছান্দোগ্যোপনিষদে বলা হয়েছে, তিনিই বিভিন্ন লোককে ধরে রেখেছেন যাতে তারা বিচ্ছিন্ন না হয়। তিনি যেন সেতুস্বরূপ।

ঈশ্বর জগতের শাসনকর্তা ও নিয়ামক

ঈশ্বর জীব জগতের ও বস্তু জগতের অন্তর্যামী। তিনি সর্বভূত দেবতার

1. মুণ্ডকো, ২।১।১ 2. মুণ্ডকো, ২।২।৭ 3. ঈশো, ১ 4. ছান্দোগ্য, ৬।৮।৪
5. বৃহদা, ৪।৪।১৩ 6. বৃহদা, ৫।৬।১ 7. তৈত্তিরীয়, ২।৮।১ ৪. কঠো, ২।৩।৩
9. ছান্দোগ্য, ৮।৪।১

অন্তর্বর্তী রূপে থাকেন। তিনি অন্তর্বর্তী রূপে থেকে সর্বভূতের দেবতাকে নিয়ন্ত্রিত করেন।[1] তিনি প্রাণদেবতার, বাগ্‌দেবতার, চক্ষুদেবতার, শ্রবণ-দেবতার, মনোদেবতার, ত্বগদেবতার, বুদ্ধিদেবতার অন্তর্বর্তী।[2] ব্রহ্ম হলেন জগৎ-আত্মা, সমস্ত বিশ্ব-জগতের অভ্যন্তরীণ নিয়ামক, সমস্ত জীবাত্মার নিয়ামক।

ঈশ্বর জীবজগতের অন্তর্বর্তী

ছান্দোগ্যোপনিষদে বলা হয়েছে, 'তিনিই নিম্নে, তিনিই ঊর্দ্ধে। তিনিই পশ্চাতে, তিনিই সম্মুখে, তিনিই দক্ষিণে, তিনিই উত্তরে, তিনিই এই সমস্ত। মস্তক তাঁর দ্যুলোক, চন্দ্র ও সূর্য্য তাঁর চক্ষু, কর্ণ দিক্‌সমূহ, বাক্য প্রকটিত বেদসমূহ, প্রাণ বায়ু এবং অন্তঃকরণ নিখিল জগৎ। তাঁর পদদ্বয় থেকে পৃথিবী জাত হয়। তিনি স্থূল মহাভূতের অন্তরাত্মা।[3]

কিন্তু ঈশ্বর শুধু জীবজগতের অন্তর্বর্তী নয়, তিনি অতিবর্তীও। প্রপঞ্চরূপ সর্বভূত তাঁর এক পাদমাত্র।[4] দ্যুলোক, পৃথিবী ও অন্তরিক্ষ এবং ইন্দ্রিয়বর্গসহ অন্তঃকরণ এই ব্রহ্মে সমর্পিত আছে।[5] ঈশ্বর কালত্রয়ের নিয়ামক।[6] যা কিছু ত্রিকালের অতীত, তাই ব্রহ্ম।[7] ছান্দোগ্যোপনিষদে বলা হয়েছে, 'যিনি আকাশ এই নামে প্রসিদ্ধ, তিনিই নাম ও রূপকে ব্যাকৃত করেন। উক্ত নাম ও রূপ যাঁর মধ্যে, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত, তিনিই আত্মা,[8] [9]ঈশোপনিষদে বলা হয়েছে, ইনি চলেন, ইনি চলেন না; ইনি দূরে আবার, ইনি নিকটে, ইনি এই সমস্ত জগতের ভিতরে, আবার এই সমস্ত জগতের বাহিরে (তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ)। কঠোপনিষদে বলা হয়েছে, 'পৃথিব্যাদি সমস্ত লোক তাঁতেই আশ্রিত। কেবল তাঁকেই কেহ অতিক্রম করতে পারে না।' (তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন)। যে অব্যক্ত জগতের মূল, তিনি সেই অব্যক্তেরও অতীত। যাঁর থেকে সূর্য্য হন এবং যাঁতে অস্তগমন করেন, তাঁতেই সব দেবতা প্রবিষ্ট আছেন। তাঁকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না।

ঈশ্বর জীবজগতের অতিবর্তীও

---

1. বৃহদা, ৩।৭।১৫ 2. বৃহ, ৩।৭।১৬—২২ 3. মুণ্ডকো, ২।১।৪ 4. ছান্দোগ্য, ৩।১২।৬
5. মুণ্ডকো, ২।২।৫ 6. কঠো. ২।১।৫ 7. মাণ্ডুক্যো, ১ 8. ছান্দোগ্য, ৮।১৪।১
9. ঈশো, ৬

ইনিই সেই সর্বাত্মক ব্রহ্ম।[1] তিনি সমুদয় বস্তুতে আছেন, এবং সমুদয় বস্তু তাঁতে অবস্থিত।[2] উক্ত ব্রহ্ম, জ্ঞাত বস্তু থেকে অবশ্য পৃথক, আবার অজ্ঞাত বস্তু থেকেও পৃথক।

ব্রহ্ম এই কালিক জগতের ভিত্তি। তিনি সকল কিছুর শাসনকর্তা, সকল কিছুর প্রভু। বিশ্ব তাঁর দ্বারা প্রকাশিত ও আলোকিত হয়, বিশ্ব তাঁতেই অবস্থিত। [3]মুণ্ডকোপনিষদে বলা হয়েছে, 'পুরোভাগে অবস্থিত এই সমস্ত অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মই, পশ্চাদ্ভাগে ব্রহ্ম, দক্ষিণ এবং উত্তরেও ব্রহ্ম, অধঃ ও ঊর্দ্ধ দিকেও ব্রহ্মই ব্যাপ্ত। ঐ উপনিষদেরই অন্যত্র বলা হয়েছে, 'ব্রহ্মে সমস্ত জগৎ সমর্পিত রয়েছে[4]। [5]ইনিই আবার বামনী কারণ ইনি নিখিল পুণ্যফলের বাহক বা বিধাতা।

ব্রহ্ম সকল কিছুর প্রভু

[6]ইনি জ্ঞাতব্য সর্ববস্তু জানেন, অথচ তাঁকে কেহ জানে না। ঈশ্বর জ্ঞাতা হিসাবে জ্ঞেয় জগতকে অতিক্রম করে যান। ব্রহ্ম হল অনন্ত ও অসীম প্রজ্ঞা। [7]ঐতরেয়োপনিষদে বলা হয়েছে প্রজ্ঞাই সমস্ত জগতের প্রবৃত্তির নিয়ামক এবং প্রজ্ঞাই সমস্ত জগতের আশ্রয়। প্রজ্ঞাই ব্রহ্ম, ঈশ্বর সমস্ত জীবের প্রভু। তিনি জগতের প্রভু, তিনি অভ্যন্তরীণ নিয়ামক, তিনি পূর্ণ। ইনি সর্বেশ্বর, ইনি অন্তর্যামী, ইনি সকলের উপাদান কারণ। ইনিই ভূতবর্গের উৎপত্তি ও বিলয় স্থান।[8] তাঁতে সকল দেবতা প্রবিষ্ট। তাঁকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না। সব প্রাণী, সব দেবতা, সব লোক, সব ইন্দ্রিয় এবং সমস্ত জীবাত্মা পরমাত্মাতে সমর্পিত। তিনি জগতের কারণ, তার কোন কারণ নেই। তাঁতেই সব জীবের আশ্রয়। তিনি সব জীবাত্মার অভ্যন্তরীণ আত্মা। তিনি তাতে প্রবিষ্ট হন এবং তাদের শাসন করেন। তিনি তাদের অন্তর্বর্তী হয়েও তাদের অতীত।

প্রজ্ঞাই ব্রহ্ম

তিনি সর্বভূতের অন্তরাত্মাস্বরূপে সকলের নিয়ামক।[9] ইনি কর্মফলভোক্তা

1. কঠো, ২।১।৯ 2. ঈশো, ৬ 3. মুণ্ডকো, ২।২।১১
4. মুণ্ডকো, ৩।২।১ 5. ছান্দোগ্য, ৪।১৪।৪ 6. শ্বেতা, ৩।১৯
7. ঐতরেয়ো, ৩।১।৩ 8. মাণ্ডুক্যো, ৬ 9. কঠো, ২।২।১২

এবং প্রাণাদির বিধারক[1]। বৃহদারণ্যকোপনিষদে[2] বলা হয়েছে পরমেশ্বর মায়াবশতঃ বহুরূপে অনুভূত হন। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদেও বলা হয়েছে, পরমেশ্বর মায়াবী স্বশক্তিসমূহের সহায়ে শাসন করেন।[3] ঐ উপনিষদেরই অন্যত্র বলা হয়েছে—পরমেশ্বরকে মায়াধীশ বলে জানবে। সেই পরমেশ্বরেরই অবয়বরূপে কল্পিত বস্তু সমূহের দ্বারা এই অখিল জগৎ পরিপূর্ণ। ঐ উপনিষদেই আরও বলা হয়েছে, অদ্বিতীয় দেব মায়াশক্তি অবলম্বনপূর্ব্বক মাকড়সার মতন আপনাকে অব্যক্তপ্রসূত নাম, রূপ ও কর্ম দ্বারা আচ্ছাদিত করেছেন।[4]

ঈশ্বর সকলের নিয়ামক

ঈশ্বর কর্মাধ্যক্ষ। তিনি জীবকে কর্মানুযায়ী ফল দান করেন। তিনি তাদের বাসনা পূর্ণ করেন। তিনি বামনী, তিনি পাপীদের শাস্তি দেন। তিনি নৈতিক শাসনকর্তা, নৈতিক বিচারক। তিনি সর্বোত্তম পুরুষ। তিনি ধর্মের আকর, পাপবিনাশক, ষড়ৈশ্বর্য্যাধিপতি। তিনি বিশ্বাধার।[5] ঐ উপনিষদেরই অন্যত্র বলা হয়েছে, পরমেশ্বরের দ্বারা এই জগৎ সর্বদাই পরিব্যাপ্ত। তিনি জ্ঞাতা, কালের স্রষ্টা, নিষ্পাপত্বাদি গুণবিশিষ্ট ও সর্ববিদ। তাঁর দ্বারাই পরিচালিত হয়ে শুভাশুভ কর্ম—পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ রূপে বিবর্তিত হয়।

ঈশ্বর অনন্ত, নিত্য, অক্ষর, সর্বগত, সর্বজ্ঞ, জগতের স্রষ্টা, সংরক্ষক এবং ধ্বংসকারক। তিনি জগৎ ও জীবনের অভ্যন্তরীণ নিয়ামক। তিনি অপাপবিদ্ধ, শুদ্ধ, ধর্ম, পূত এবং পূর্ণ। তিনি সত্যকাম এবং সত্যসঙ্কল্প। তিনি নৈতিক পূর্ণতার অনন্ত প্রতীক। [6]বৃহদারণ্যকোপনিষদে বলা হয়েছে 'ইনি সকলের নিয়ামক, সকলের ঈশ্বর, সকলের অধিপতি। ইনি শুভকর্মের দ্বারা মহীয়ান্ বা অশুভকর্মের দ্বারা হীনতর হন না। ইনি সর্বেশ্বর। ইনি ভূতাধিপতি ও ইনি ভূতপাল। ইনি পাপশূন্য, জরাহীন, মৃত্যুহীন, শোকহীন, ক্ষুধাহীন, পিপাসাহীন, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প। [7]ছান্দোগ্যোপনিষদে বলা হয়েছে তিনি সত্যসঙ্কল্প, আকাশাত্মা, সর্বকর্মা, সর্বকাম, সর্বগন্ধ ও সর্বরস। তিনি এই সমস্ত জগৎ

1. কঠো, ২।১।৫ 2. বৃহদা. ২।৫।১৯ 3. শ্বেতা, ৩।১
4. শ্বেতা, ৬।১০ 5. শ্বেতা. ৬।৬ 6. বৃহদা, ৪।৪।২২ 7. ছান্দোগ্য, ৩।১৪।২

জুড়ে বর্তমান। তিনি সর্বব্যাপী, জ্যোতির্ময়, অশরীর, অক্ষত, শিরাহীন, নির্মল, অপাপবিদ্ধ, সর্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা, সর্বোত্তম ও স্বয়ম্ভু।[1]

ঈশ্বর বেদের স্রষ্টা। তাঁর থেকেই ঋকমন্ত্র, সামমন্ত্র ও যজুর্মন্ত্রসমূহ জাত হয়।[2] তিনি বিধির শ্রষ্টা। তিনি পরমার্থ, তিনি পরম গতি, (সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ[3])।

ব্রহ্ম নির্বিশেষ ও সবিশেষ উভয়ই। নির্বিশেষ রূপে তিনি নির্গুণ। কিন্তু জীব ও জগতের সম্পর্কে তিনি সগুণ।

১২। জগৎ:

উপনিষদে জগৎ সম্পর্কে দুটি মতবাদ দেখতে পাওয়া যায়। একটি মত অনুসারে জগৎ যথার্থই ব্রহ্ম থেকে উদ্ভূত। অপর একটি মত অনুযায়ী জগৎ ব্রহ্মের অবভাসমাত্র। উপনিষদমতে সমগ্র জগৎ কোন জড়বস্তু থেকে উৎপন্ন নয়, আত্মা থেকে উৎপন্ন। [4]শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের সুরুতেই ব্রহ্মবাদিগণ পরস্পরকে প্রশ্ন করছেন,—"হে ব্রহ্মজ্ঞগণ এই জগতের কারণ কি ব্রহ্ম? আমরা কোথা থেকে উৎপন্ন হয়েছি, কার দ্বারা জীবিত আছি এবং অবশেষে কোথায় অবস্থান করি? কার পরিচালনাধীনে আমাদের সুখ দুঃখ ভোগ হয়ে থাকে?". [5]শ্বেতাশ্বতরোপনিষদেই বলা হয়েছে যে কাল, স্বভাব, নিয়তি, যদৃচ্ছা, পঞ্চভূত অথবা বিজ্ঞানাত্মা জগৎ-কারণ হতে পারে না। এরা সংহত হয়েও কারণ হতে পারে না কেন না সংহতির কারণ আত্মা রয়েছে। জীবাত্মাও কারণ নয় কেননা জীবাত্মা পাপ-পুণ্যের অধীন। পরমাত্মা পরাৎপর পরমেশ্বর যখন মায়ার (প্রকৃতির) আশ্রয় গ্রহণ করেন, সেই সময় তাঁর কোন অনির্বচনীয় শক্তি থেকেই এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডসঞ্জাত হয়।

জগৎ সম্পর্কে দুটি মতবাদ

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে প্রশ্ন ও উত্তর

---

1. ঈশো, ৮ 2. মুণ্ডকো, ২।১।৬, বৃহদা, ২।৪।১০ 3. কঠো, ১।৩।১১
4. শ্বেতা, ১।১ 5. শ্বেতা, ১।২-৩

কোন বহিঃস্থিত বস্তু থেকে জগৎ সৃষ্ট নয়

উপনিষদ মতে ব্রহ্ম কোন বহিঃস্থিত বস্তু থেকে জগৎ সৃষ্টি করেন নি। মাকড়সা যেমন নিজের মধ্য থেকেই জগৎ সৃষ্টি করে আবার তাকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করে, তেমনি ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করার পর আবার তাকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করেন। পূর্ব্বস্থিত কোন জড় পদার্থ থেকে ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করেন না। কেননা সৃষ্টির পূর্বে কোন জড়ের অস্তিত্ব ছিল না, একমাত্র আত্মারই অস্তিত্ব ছিল।

ঐতরেয়োপনিষদে জগতের উৎপত্তির বিবরণ

[1]ঐতরেয়োপনিষদের সুরুতে বলা হয়েছে, "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ।" সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ একমাত্র আত্মস্বরূপেই বর্তমান ছিল। নিমেষাদি ক্রিয়াশীল অন্য কিছুই ছিল না। সেই আত্মা ঈক্ষণ করলেন, 'আমি লোকসমূহ সৃজন করব। অতঃপর তিনি অম্ভোলোক, মরীচিলোকসমূহ, মরলোক ও আপলোক সৃজন করলেন। দ্যুলোকের ঊর্দ্ধে অম্ভোলোক অবস্থিত। অন্তরিক্ষই মরীচিলোক। পৃথিবীই মরলোক। যে সব লোক পৃথিবীর অধোভাগে তারাই আপলোক।

তৈত্তিরীয়োপনিষদে জগৎ সৃষ্টির বর্ণনা

[2]তৈত্তিরীয়োপনিষদে বলা হয়েছে, পরমাত্মা কামনা করলেন, 'আমি বহু হব, আমি উৎপন্ন হব। (বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি)। তিনি যা কিছু তৎসমুদয়ই সৃষ্টি করলেন এবং সৃষ্টি করে তাতে প্রবেশ করলেন। ঐ উপনিষদে আরও বলা হয়েছে, এই নামরূপাকারে অভিব্যক্ত জগৎ সৃষ্টির পূর্বে অবিকৃত বস্তুরূপেই ছিল। সেই অব্যাকৃত নামরূপ ব্রহ্ম থেকেই নামরূপে অভিব্যক্ত জগৎ জাত হল[3]।

ছান্দোগ্যোপনিষদে জগতের উৎপত্তির কথা

[4]ছান্দোগ্যোপনিষদে বলা হয়েছে, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম [5]তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত'। অর্থাৎ এই সমস্ত জগৎ স্বরূপতঃ ব্রহ্মই, কারণ তা হইতেই উহা জাত হয়, তাঁতে লীন হয় এবং তাঁতে জীবিত থাকে।

1. ঐতরেয়, ১।১।১-২ 2. তৈত্তিরীয়, ২।৬
3. তৈত্তিরীয়, ২।৭ 4. ছান্দোগ্য, ৩।১৪।১
5. তজ্জলান্=তজ্জম্+তল্লম্+তদনম্; জন ধাতুর অর্থ জাত হওয়া। 'লী'র অর্থ লয় হওয়া এবং "অন্"-এর অর্থ জীবন ধারন করা।

[1]তৈত্তিরীয়োপনিষদেও বলা হয়েছে, "যা থেকে এই অখিল ভূতবর্গ উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হয়ে যার দ্বারা বর্ধিত হয় এবং বিনাশকালে যাঁতে গমন করে ও যাঁতে বিলীন হয়, তিনিই ব্রহ্ম।" [2]ঐ উপনিষদে আরও বলা হয়েছে, 'এই আত্মা থেকে আকাশ উৎপন্ন হল, আকাশ থেকে বায়ু, বায়ু থেকে অগ্নি, অগ্নি থেকে জল, জল থেকে পৃথিবী, পৃথিবী থেকে ওষধিসকল এবং ওষধি থেকে অন্ন এবং অন্ন থেকে মানুষ উৎপন্ন হল।' [3]চূলিকোপনিষদেও বলা হয়েছে, 'সমুদ্রে যেমন বুদ্‌বুদ্ জন্মে সমুদ্রেই বিলীন হয়, সেরূপ জগৎ ব্রহ্মে সঞ্জাত হয়ে ব্রহ্মেই লয় পেয়ে থাকে।'

তৈত্তিরীয়োপনিষদে ও চুলিকোপনিষদে জগৎ সৃষ্টির কথা

[4]ঈশোপনিষদে ব্রহ্মই যে জগৎ কারণ তা ব্যক্ত করা হয়েছে। এই উপনিষদের সুক্ততেই বলা হয়েছে এই ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু অনিত্য বস্তু আছে, এ সমস্তই পরমেশ্বরের দ্বারা আবরণীয়। অর্থাৎ জগতের উপাদান ঈশ্বর থেকেই এসেছে। কেনোপনিষদে বলা হয়েছে যে ব্রহ্মই সব বস্তুর আদি প্রেরয়িতা।

ঈশোপনিষদে ব্রহ্মকেই জগৎকারণ বলা হয়েছে

ব্রহ্ম জগতের অন্তর্বর্তী এবং অতিবর্তী উভয়ই। ব্রহ্মই জগতের উপাদান কারণ এবং নিমিত্ত কারণ। ছান্দোগ্যোপনিষদে বলা হয়েছে, 'এই জগৎ পূর্বে এক অদ্বিতীয় অসৎস্বরূপ ছিল। সেই অসৎ থেকে সৎ জাত হল। উক্ত সৎ ইচ্ছা করলেন, 'আমি বহু হব, প্রকৃষ্ট রূপে জাত হব। তিনি তেজ সৃষ্টি করলেন। উক্ত তেজ বহু হবার ইচ্ছা করল এবং জল সৃষ্টি করল। উক্ত জল অন্ন অর্থাৎ পৃথিবী সৃষ্টি করল।

ছান্দোগ্যোপনিষদে জগৎ সৃষ্টির বর্ণনা

বৃহদারণ্যকোপনিষদে বলা হয়েছে যে জগৎ প্রথমে অব্যক্ত অবস্থায় ছিল এবং পরে নাম ও রূপের আকারে ব্যক্ত হয়েছিল। ক্ষুরাধারে যেমন ক্ষুর প্রবেশিত থাকে অথবা অগ্নি যেমন স্বীয় উৎপত্তিস্থানে থাকে তেমনি উক্ত এই

1. তৈত্তিরীয়, ৩।১ 2. তৈত্তিরীয় ২।১।৩ 3. চুলিকোপনিষদ, ১৭
4. ঈশো, ১ 5. বৃহদা, ১।৪।৭

আত্মা এই নিখিল দেহে নখাগ্র পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হয়ে আছেন। মাকড়সা থেকে যেমন জালের নির্গমন হয়, অগ্নি থেকে ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গগুলির বিকীরণ হয়, তেমনি আত্মা থেকে সব ইন্দ্রিয়, সব লোক, সব দেবতা, সব প্রাণী বিবিধ রূপে উৎপন্ন হয়।[1] [2]মুণ্ডকোপনিষদেও বলা হয়েছে মাকড়সা যেমন নিজ শরীর থেকে সূতা উৎপাদন করে ও আত্মসাৎ করে, মৃত্তিকা থেকে যেমন ওষধি সমূহ জাত হয়, পুরুষ শরীর থেকে বিজাতীয় কেশ ও লোমসমূহ নির্গত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্ম থেকে সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হয়।

বৃহদারণ্যকোপনিষদে ও মুণ্ডকোপনিষদে জগৎ সৃষ্টির বর্ণনা

ব্রহ্ম থেকে অব্যাকৃত প্রকৃতি জাত হয়। প্রকৃতি থেকে হিরণ্যগর্ভ, হিরণ্যগর্ভ থেকে মন, মন থেকে পঞ্চভূত এবং তা থেকে ক্রমে লোকসমূহ উৎপন্ন হয়। [3]মুণ্ডকোপনিষদে আরও বলা হয়েছে, 'যেরূপ সুদীপ্ত অনল থেকে অগ্নির সজাতীয় সহস্র সহস্র অগ্নিকণা নির্গত হয়, যেরূপ ব্রহ্ম থেকে নানাবিধ জীব উদ্ভূত হয় এবং তাতেই বিলীন হয়।' যদিও এই জগৎ অন্তরাত্মা থেকে উদ্ভূত তবু এই জগতের দোষে অন্তরাত্মা দুষ্ট হন না। [4]কঠোপনিষদে বলা হয়েছে, "সূর্য্য যেরূপ জীবমাত্রের দর্শনের হেতু হয়েও চাক্ষুষ পাপ ও অশুচি দর্শনাদিরূপ বাহ্যদোষের দ্বারা লিপ্ত হন না, সেরূপ সর্বভূতের অন্তরাত্মা জাগতিক দুঃখে লিপ্ত হন না, কেননা তিনি তদতীত।"

এই জগতের জড়বস্তু ও জীব উভয়েরই মূল কারণ আত্মা। ছান্দোগ্য উপনিষদের বক্তব্য উদ্ধৃত করে আগেই দেখান হয়েছে যে ব্রহ্ম থেকে ক্রমান্বয়ে অগ্নি, জল ও পৃথিবী এই তিন ভূত উৎপন্ন হয়েছে। [5]তৈত্তিরীয়োপনিষদেও পূর্বে বলা হয়েছে যে আত্মা থেকে আকাশ, আকাশ থেকে বায়ু, বায়ু থেকে অগ্নি, অগ্নি থেকে জল, জল থেকে পৃথিবী, পৃথিবী থেকে ওষধি সমূহ, ওষধি থেকে অন্ন এবং অন্ন থেকে মানুষ উৎপন্ন হল। মৌলিক পদার্থগুলি থেকেই

তৈত্তিরীয়োপনিষদে মৌলিক পদার্থ থেকে স্থূল ভূতের উৎপত্তির কথা

1. বৃহদা. ২।১।২০ 2. মুণ্ডকো. ১।১।৭ 3. মুণ্ডকো. ২।১।১
4. কঠো ২।২।১১ 5. তৈত্তি. ২।১।৩

যে স্থূল ভূতের উদ্ভব উপনিষদে তার উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। [1]প্রশ্নোপনিষদে সূক্ষ্ম পদার্থগুলিকে পৃথিবীমাত্রা, তেজোমাত্রা, বায়ুমাত্রা, আকাশমাত্রা আপোমাত্রা বলা হয়েছে। মৌলিক পদার্থগুলির পরস্পর মিশ্রণের নীতিটি যে উপনিষদের অগোচর ছিল না [2]ছান্দোগ্য উপনিষদই তার প্রমাণ। ছান্দোগ্য উপনিষদে তিনটি মৌলিক পদার্থের 'ত্রিবৃৎ' করার অর্থাৎ তিনের পরস্পরের সঙ্গে মিশ্রিত করার কথা আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে, "উক্ত তিন দেবতার প্রত্যেককে ত্রিবৃৎ করব"। এই চিন্তা করে উক্ত এই দেবতা এই তিনটি দেবতার মধ্যে প্রাণবিধারক আত্মা রূপে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে নাম ও রূপ ব্যক্ত করলেন। আসলে ত্রিবৃৎ প্রক্রিয়াটি হল প্রত্যেক মহাভূতকে প্রধান রূপে গ্রহণ করে অপর অপ্রধান দুটিকে তাঁর সঙ্গে মিশ্রিত করা—যেমন (সূক্ষ্ম) তেজ দুভাগের এক ভাগ + জল চার ভাগের এক ভাগ + পৃথিবী চার ভাগের এক ভাগ = স্থূল তেজ। পরবর্তীকালে যে পঞ্চীকরণ প্রক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে, সেই প্রক্রিয়া হল আকাশ দুভাগের এক ভাগ + বায়ু আট ভাগের এক ভাগ + তেজ আট ভাগের এক ভাগ + জল আট ভাগের এক ভাগ + পৃথিবী আট ভাগের এক ভাগ = স্থূল আকাশ। এই ত্রিবৃৎ প্রক্রিয়া আবার দু প্রকার। (১) শরীরে ত্রিবৃৎকরণ এবং (২) ঐ শরীর সমূহের বাইরে মূল মহাভূতবর্গের ত্রিবৃৎকরণ। প্রথমটির উদাহরণ, অন্ন ভক্ষিত হয়ে ত্রিবিধাকারে পরিণত হয়। তার যেটি স্থূলতম অংশ তা মলে, মধ্যমাংশ মাংসে ও সূক্ষ্মতম অংশ মনে পরিণত হয়।

প্রশ্নোপনিষদে ও ছান্দোগ্য উপনিষদে মৌলিক পদার্থের পরস্পর মিশ্রণের কথা

ত্রিবৃৎ প্রক্রিয়া

[3]ছান্দোগ্য উপনিষদে ভূতবর্গের তিনটি কারণের কথা বলা হয়েছে—অণ্ডজ, জীবজ ও উদ্ভিজ্জ। স্বেদজ প্রভৃতি জীবেরা এই তিনেরই অন্তর্ভুক্ত। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে সৃষ্টি ও লয়ের উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ব্রহ্মকে 'ঈশা' বলা হয়েছে। ব্রহ্মকে শিব, রুদ্র, হর এবং মহেশ্বরও বলা হয়েছে। নীলরুদ্রোপনিষদে বলা হয়েছে, 'হে রুদ্র, তুমি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি-হেতু।

ছান্দোগ্য উপনিষদে ভূতবর্গের তিনটি কারণের কথা

1. প্রশ্নো, ৪।৮ 2. ছান্দোগ্য, ৬।৩।৩ 3. ছান্দোগ্য, ৬।৩।১

তোমাকে প্রণাম'। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে বলা হয়েছে 'সেই রুদ্রই এই সমুদয় লোককে নিজ শক্তির দ্বারা নিয়মিত করেন। তিনি প্রত্যেক জীবের অন্তর্যামি রূপে অবস্থিত আছেন। তিনি নিখিল বিশ্ব সৃষ্টি করে তার পালক হন এবং প্রলয়কালে তাকে সংহার করেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলা হয়েছে যে ঈশ্বর মায়াধীশ। প্রকৃতিই মায়া। ঈশ্বর মায়াশক্তির অবলম্বনে এই জগৎকে সৃজন করেন এবং সেই সৃষ্ট জগতে অবিদ্যা দ্বারা জীব রূপে বদ্ধ হন।

সুবাল উপনিষদে সৃষ্টি প্রক্রিয়ার নিম্নলিখিত বিবরণ লক্ষ্য করা যায়।

সুবাল উপনিষদে সৃষ্টি প্রক্রিয়ার বিবরণ

প্রথমতঃ সৎ ছিল না, অসৎও ছিল না, সৎ এবং অসৎ উভয়ই ছিল না। এর থেকে তমসের সৃষ্টি হল। তমসের থেকে ভূতাদির সৃষ্টি হল। ভূতাদি থেকে ব্যোমের সৃষ্টি। ব্যোমের থেকে বায়ুব সৃষ্টি। বায়ু থেকে অগ্নির সৃষ্টি। অগ্নি থেকে জলের সৃষ্টি, জল থেকে ক্ষিতির সৃষ্টি। আবার সব জীব ক্ষিতিতে বিলীন হয়ে যায়। ক্ষিতি জলে, জল অগ্নিতে, অগ্নি বায়ুতে এবং বায়ু ব্যোমে বিলীন হয়ে যায়। ব্যোম ইন্দ্রিয়ে, ইন্দ্রিয় তন্মাত্রায় এবং তন্মাত্রা ভূতাদিতে, ভূতাদি মহতে, মহৎ অব্যক্তে, অব্যক্ত অক্ষরে, অক্ষর তমসেতে এবং তমস পরাদেবে (Supreme Lord) বিলীন হয়ে যায়। এর পরে সৎ বা অসৎ বা সৎ এবং অসৎ কোনটিই নেই। অব্যক্ত হল প্রকৃতি, অক্ষর হল ব্রহ্ম বা আদি পুরুষ। পরব্রহ্ম, অপর-ব্রহ্ম বা ঈশ্বর, তমস, অক্ষর, অব্যক্ত, মহৎ, ভূতাদি, পঞ্চতন্মাত্রা, পঞ্চ মহাভূতাদি হল সৃষ্টির ক্রম।

আবার অপর এক মতানুসারে প্রকৃত সৃষ্টি বলে কিছু নেই। এই

দ্বিতীয় মতানুসারে প্রকৃত সৃষ্টি বলে কিছু নেই

মতানুসারে জগত অবভাস মাত্র। এর প্রকৃত কোন সত্তা নেই। উপনিষদে এই বিষয়টিকেই অনেক ক্ষেত্রে মায়াবাদের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। অবশ্য মায়াবাদ পরিপূর্ণ মতবাদ রূপে উপনিষদে স্থান পায়নি। তবে উপনিষদে মায়াবাদী চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। [1]বৃহদারণ্যকোপনিষদের

1. বৃহদা. ২।৪।১৪

এক জায়গায় বলা হয়েছে, যে যখন ব্যষ্টিভাবের উদয় হয় তখন যেহেতু ব্রহ্মে দ্বৈতপ্রায় হয়। 'যেহেতু' শব্দের দ্বারা জগতের প্রকৃত সত্তা নেই, জগৎ মিথ্যা মায়ামাত্র এরূপ ইঙ্গিতই করা হচ্ছে। [1]ছান্দোগ্যোপনিষদে বলা হয়েছে, 'সব বস্তুর পরিণাম নাম অবলম্বনে অবস্থিত নামমাত্র। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে মায়া শব্দ ভ্রান্তি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং ঈশ্বরকে 'মায়াবী' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। [2]বৃহদারণ্যকোপনিষদে বলা হয়েছে, 'পরমেশ্বর মায়বশতঃ বহুরূপে অনুভূত হন'।

১৩। মায়াবাদ (The Doctrine of Māyā):

বাদরায়ণ উপনিষদের দর্শনকে সূত্রাকারে গ্রথিত করে ব্রহ্মসূত্র রচনা করেছিলেন। এই ব্রহ্মসূত্রের অন্যতম ভাষ্যকার হলেন শঙ্করাচার্য্য। তাঁর প্রতিপাদ্য ব্যাখ্যাটি মায়াবাদ নামে খ্যাত। সময় সময় এমন কথা বলা হয় যে শঙ্করাচার্য্য তাঁর মায়াবাদ বৌদ্ধদর্শন থেকে গ্রহণ করেছেন, আবার মতান্তরে মায়াবাদ তাঁর নিজস্ব কল্পনার সৃষ্টি। এই দুটি অভিমতই ভ্রান্ত। উপনিষদে যে মায়াবাদের বীজ আছে তা অস্বীকার করা চলে না।

উপনিষদে মায়াবাদের সমর্থক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কি কি বাণী আছে দেখা যাক।

[3]বৃহদারণ্যকোপনিষদে বলা হয়েছে

রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব
তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়।
ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে
যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতা দশ॥

পরমেশ্বর বিভিন্ন রূপের অনুযায়ী রূপান্তরিত হয়েছেন। তাঁর এরূপ তত্ত্ব প্রকাশের জন্য। পরমেশ্বর মায়াবশতঃ বহুরূপে অনুভূত হন। কারণ জীবাত্মার

1. ছান্দোগ্য, ৬।১।৬ 2. বৃহদা, ২।৫।১৯ 3 বৃহদা, ২।৫।১৯

দেহে দশটি এমন কি শত শত ইন্দ্রিয় সকল রথে অশ্বের মতন সংযোজিত আছে। শঙ্করাচার্য্য তাঁর ভাষ্যেতে মায়াবাদের সমর্থনে উপরিউক্ত বচনটির রূপক ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি তার অর্থ করতে গিয়ে বলেন যে ব্রহ্ম মায়ার সাহায্যে নিজেকে বহুরূপে প্রকাশ করেন এবং সেই অবস্থায় বিভিন্ন জীবের যখন রূপ ধারণ করেন তখন কোথাও তার ইন্দ্রিয় হয় দশ, কোথাও একশত।

মায়াবাদের সমকর্থ বাণী

কঠোপনিষদে এক জায়গায় বলা হয়েছে যে যা অবিদ্যা এবং যা বিদ্যা বলে খ্যাত, তারা উভয়ে অত্যন্ত ভিন্ন এবং বিরুদ্ধপথগামী। ..যারা অবিদ্যা-পরিবেষ্টিত হয়ে নিজেদের প্রজ্ঞাবান ও শাস্ত্রকুশল বলে অভিমান করে, সেই সব মূঢ় অন্ধের দ্বারা পরিচালিত অন্ধের মত অতিশয় কুটিলগতি সহকারে (দক্ষিণাদি মার্গে) পরিভ্রমণ করে থাকে।

[1]কঠোপনিষদের আর একটি বচন আছে যা মায়াবাদকে আংশিকভাবে সমর্থন করে।

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং
তথাহরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং
নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে।

যিনি শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ-বিহীন, যিনি অক্ষয় শাশ্বত অনাদি ও অনন্ত, যিনি মহতত্ত্ব থেকে বিলক্ষণ ও কূটস্থ নিত্য। তাঁকে অবগত হলেই সাধক মৃত্যুমুখ থেকে বিমুক্ত হন। কারও কারও মতে উপনিষদের উপরিউক্ত বচন মায়াবাদকে আংশিক ভাবে সমর্থন করে। ব্রহ্মের মূর্ত রূপ পরিবর্তনশীল, আর ব্রহ্মের অমূর্ত রূপ স্থির, অচঞ্চল। তাহলে ব্রহ্মের নানারূপে অভিব্যক্ত রূপের উপর অনাস্থা এসে পড়ে।

[2]মুণ্ডকোপনিষদে এক জায়গায় বলা হয়েছে 'এই পরম, অমৃত ও সর্বস্বরূপ ব্রহ্মকে যিনি সব প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থিত বলে জানেন, তিনি জীবিতাবস্থাতেই

1. ১।৩।১৫ 2. ২।১।১০.

অবিদ্যাগ্রন্থি ছেদন করেন।' সর্বাত্মক পুরুষই একমাত্র সত্য। বাক্যারব্ধ নামরূপাত্মক জগৎ মিথ্যা, অতএব পুরুষই এই সমস্ত বিশ্ব, পুরুষ থেকে ভিন্ন আর কিছু নেই। [1]বৃহদারণ্যকোপনিষদে যা পরমতত্ত্ব নয়, তাকে অসৎ, অন্ধকার এবং মৃত্যুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। প্রশ্নোপনিষদে বলা হয়েছে, 'তেষামসৌ বিরজো ব্রহ্মলোকঃ, ন যেষু জিহ্মমনৃতং ন মায়া চ, ইতি'। এর অর্থ হল যাদের মধ্যে কুটিলতা, মিথ্যাতে অনুরাগ এবং মিথ্যাচারণ, অজ্ঞানজনিত মোহ ও আসক্তি নেই—তাঁরাই সেই বিশুদ্ধ ব্রহ্মলোক গমন করে থাকেন।

[2]বৃহদারণ্যকোপনিষদে বলা হয়েছে. 'যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং জিঘ্রতি, তদিতর ইতরং পশ্যতি··'এর অর্থ যখন ব্যষ্টিভাবের উদয় হয় তখন যেহেতু ব্রহ্মে দ্বৈতপ্রায় হয়ে থাকে, (অতএব) তখন একে অপরকে আঘ্রাণ করে, একে অপরকে দর্শন করে······। যখন ব্যষ্টিভাবের উদয় হয়, এর অর্থ যে প্রকৃতপক্ষে কোন দ্বৈতভাব নেই। [3]ছান্দোগ্যোপনিষদে বলা হয়েছে, সমস্ত বিকারই বাগবলম্বনে অবস্থিত নামমাত্র। কেবল আত্মাই সত্য। [4]শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে বলা হয়েছে, 'যে অদ্বিতীয় দেব মায়াশক্তি অবলম্বন পূর্বক মাকড়সার মতন আপনাকে অব্যক্তপ্রসূত নাম, রূপ ও কর্ম দ্বারা আচ্ছাদিত করেছেন, তিনি ব্রহ্মের সঙ্গে আমাদের ঐক্য বিধান করুন'।

উপরিউক্ত উপনিষদ উদ্ধৃত বচনগুলির ভিত্তিতে কোন কোন সুধী-ব্যক্তি[5] এই সিদ্ধান্ত এসেছেন যে উপনিষদে মায়াবাদের বীজ রয়েছে। কিন্তু কেউ কেউ মনে করেন যে উপনিষদে মায়াবাদের বীজ থাকলেও, উপনিষদে মায়াবাদের সমর্থন নেই। তাই[6] কেউ কেউ বলেন, "···সর্বেশ্বরবাদই উপনিষদের মূল চিন্তাধারা। বহু ও নানা হতে পরস্পর সম্পর্কিত বহু ও নানাকে জড়িয়ে নিয়ে এক ব্যাপক একত্বের কথাই উপনিষদের মূল চিন্তাধারা বলে। বহু ও নানাকে বর্জন করে অবিমিশ্র একত্বের প্রতি তা আকৃষ্ট হয়নি, অবিমিশ্র একবাদই হল মায়াবাদ। উপনিষদের পরিবেশ বলে উপনিষদ সেদিকে আকৃষ্ট হয়নি।' থিবট (*Thibaut*)-ও

মায়াবাদ সমর্থন

1. ১।৩।২৮, 2. ২।৪।১৪ 3. ৬।১।৪ 4. ৬।৯
5. R. D. Ranade: A Constructive Survey of Upanisadic Philosophy.
6. হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়: উপনিষদের দর্শন, পৃঃ ১০২

মনে করেন যে মায়াবাদ উপনিষদের দ্বারা সমর্থিত নয়। তিনি মনে করেন যে ব্রহ্ম কোন অমূর্ত চৈতন্য নয়। তাঁর মতে পরমতত্ত্বকে অমূতরূপে ধারণা করা উপনিষদের দ্বারা সমর্থিত নয়, ব্রহ্ম অদ্বৈত। কিন্তু যেহেতু সৃষ্টি মিথ্যা, এমন মনে করার কোন কারণ নেই। কিন্তু কোন কোন ব্যাখ্যাকার মনে করেন যে মায়াবাদ উপনিষদের দ্বারা সমর্থিত। ডসেন (*Deussen*) বলেন যে উপনিষদে চারটি সৃষ্টি সম্পর্কীয় মতবাদ আছে, প্রথমতঃ, যে জড় থেকে জগতের সৃষ্টি সেই জড় ঈশ্বরের উপর নির্ভর না করে অনন্তকাল ধরে ঈশ্বরের সঙ্গে সহ অবস্থানকারী। দ্বিতীয়তঃ, ঈশ্বর শূন্য থেকে জগৎ সৃষ্টি করেছেন। যদিও জগৎ ঈশ্বরের সৃষ্টি, জগৎ ঈশ্বরের উপর নির্ভর নয়। তৃতীয়তঃ, ঈশ্বর নিজেকে জগতে রূপান্তরিত করে জগৎ সৃষ্টি করেন এবং চতুর্থতঃ, ঈশ্বরই সৎ; প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টি বলে কিছু নেই। তাঁর মতে শেষেরটিই হল প্রকৃতপক্ষে উপনিষদের অভিমত। দেশে কালে যে জগতের অস্তিত্ব, সে জগৎ অবভাস, ভ্রম মাত্র। ঈশ্বরকে জানতে হলে এই অবভাসের জগতকে বাতিল করে দিতে হবে। ডসেন (*Deussen*) কেন এই ধরনের অভিমত গ্রহণ করলেন, সে সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে রাধাকৃষ্ণণ[1] বলেন যে,

ডসেনের অভিমত

ডসেনের নিজের বিশ্বাস যে সব ধর্মের সারবস্তু হল জগতের সত্তাকে খণ্ডন করা। স্বাধীন চিন্তার উপর ভিত্তি করে ডসেন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবার পর প্রাচীন ভারতের দার্শনিক চিন্তাধারার মধ্যে, উপনিষদে, শংকরের ব্যাখ্যায়, প্রাচীন গ্রীক দর্শনে তার সমর্থন খুঁজে পাবার জন্য সচেষ্ট হলেন। নিজের অভিমতের সমর্থন খুঁজতে গিয়ে তিনি ঘটনাকে অগ্রাহ্য করেছেন। তিনি নিজে স্বীকার করেছেন যে উপনিষদের প্রচলিত মতবাদ হল সর্বেশ্বরবাদ, কিন্তু মৌলিক মতবাদ হল মায়াবাদ। মায়াবাদের স্বপক্ষে প্রথম যে যুক্তি দেখান হয় তা হল ব্রহ্মই একমাত্র সৎবস্তু। সুতরাং সিদ্ধান্ত করতে হয় জগৎ অসৎ। ডসেন বলেন,

রাধাকৃষ্ণনের সমালোচনা

1. S. Radhakrishnan ; Indian Philosophy Vol. 1., Page 189.

প্রকৃতি আমাদের কাছে যে বহুত্ব ও পরিবর্তনকে উপস্থাপন করে তা ভ্রম মাত্র। ফ্রেসার (*Fraser*)-ও ডসেনের অভিমত সমর্থন করে বলেন যে উপনিষদে আত্মা বা ব্রহ্মের দ্বৈত-হীনতার কথা বার বার বলা হয়েছে ; স্বীকার করা হয়েছে যে, ব্রহ্মই একমাত্র সৎবস্তু, কাজেই স্বাভাবিকভাবে এবং যৌক্তিকভাবে সব অবভাস যে ভ্রম, এই সিদ্ধান্ত তার থেকে নিঃসৃত হয়।

ডসেনের অভিমতের সমালোচনায় রাধাকৃষ্ণন বলেন যে, উপনিষদে যে ব্রহ্মকেই একমাত্র সৎবস্তু বলা হয়েছে তা অস্বীকার করা চলে না। ব্রহ্মকে জানা হলে সব কিছু জ্ঞাত হয়, একথাও ঠিক। ব্রহ্মের বাইরে যে কোন বহুত্ব বা পরিবর্তন নেই, এও সত্য। কিন্তু তা বলে বহুত্ব এবং পরিবর্তনের মোটেও কোন অস্তিত্ব নেই, এ সত্য স্বীকার করা চলে না। দ্বিতীয়তঃ, রাধাকৃষ্ণণ বলেন যে ডসেন, ফ্রেসার প্রমুখ পণ্ডিতগণ অসীম (infinite)-কে এক মিথ্যা অর্থে গ্রহণ করেছেন। অসীমকে অ-সান্ত (not-finite)-র সঙ্গে অভিন্ন অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু উপনিষদ কোথাও বলেনি যে অসীম সান্ত বহির্ভূত (the infinite excludes the finite)। যখনই উপনিষদে বলা হয়েছে যে ব্রহ্মই একমাত্র সৎবস্তু, তখন উপনিষদে এইকথা বলা হয়েছে যে জগতের মূল, ব্রহ্মে স্থিত। কাজেই জগতেরও সত্তা আছে। ব্রহ্ম যদি একমাত্র সৎবস্তু হয় তাহলে যা ব্রহ্মের অন্তর্ভুক্ত বা ব্রহ্মে স্থিত তার আপেক্ষিক সত্তা স্বীকার করতে হয়।

অসীম সান্ত-বহির্ভূত নয়

ডসেন বলেন যে, উপনিষদের যে যে অংশে বলা হয়েছে যে আত্মা' জ্ঞাত হলে সব কিছু জ্ঞাত হয়, সেই সব অংশ বহুত্বের জগতকে অস্বীকার করে। রাধাকৃষ্ণন বলেন যে 'আত্মা যদি এক সর্বব্যাপী সত্তা হয় তাহলে স্বাভাবিক-ভাবে আত্মাকে জানা হলে সব জানা হবে। বস্তুতঃ, বৃহদারণ্যকোপ-নিষদে বলা হয়েছে, 'এই ব্রাহ্মণজাতি, এই ক্ষত্রিয়জাতি, এই লোকসমূহ, এই দেববৃন্দ, এই ভূতবর্গ, এবং এই নিখিল বস্তু (তাই) যা এই আত্মা, (২।৪।৬)। কিন্তু উপনিষদে কোথাও একথা বলা হয়নি যে আত্মা এবং জগৎ পরস্পরকে অস্বীকার করে। বিভেদকে অস্বীকার করলে পরমতত্ত্ব হয়ে পড়ে এক শূন্যগর্ভ সত্তা। বস্তুতঃ, এটা হয়ে পড়ে সত্তাহীনতার সামিল। অনন্তের পক্ষে

সান্তকে বর্জন করার কোন প্রয়োজনই হয় না। বরং সান্ত অনন্তে বিধৃত, সসীম অসীমে স্থিত, এই সিদ্ধান্তই যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। সম্ভাব্য এবং স্ব-লক্ষণ (individual)-কে বর্জন করার অর্থ সার্বিক ও অবস্তুত্বকে মিথ্যা গণ্য করা। জগৎ মিথ্যা ভ্রম মাত্র—এই যদি উপনিষদের যথার্থ অভিমত হয় তাহলে উপনিষদ জগতের আপেক্ষিক সত্তার কথা কখনও ব্যক্ত করতে পারে না। জগতের বহুত্ব ও পরিবর্তন অনেক সময় ব্রহ্মই যে পরমতত্ত্ব, আমাদের বুঝতে দেয় না। অজ্ঞানতা হেতু আমরা মনে করি জগৎ ব্রহ্মের শুদ্ধ প্রকৃতিকে ঢেকে রাখে। জগতের যাবতীয় বস্তু, জীবাত্মা যে ব্রহ্মেই বিধৃত, এ সত্য আমরা ভুলে যাই। মায়া ভ্রমের জন্যই এই বিশ্বাস আমাদের মনে জাগে যে জাগতিক বস্তুর ও জীবাত্মার বোধ হয় স্ব-নির্ভর সত্তা আছে। কিন্তু জীবাত্মার মধ্যে যখন আত্মজ্ঞান জাগে তখন জীবাত্মা উপলব্ধি করে যে ব্রহ্মেরই একমাত্র স্ব-নির্ভর সত্তা আছে, জীবাত্মার সত্তা ব্রহ্মের সত্তার তুলনায় আপেক্ষিক।

উপনিষদের প্রতিপাদ্য মতবাদ সর্বেশ্বরবাদ

বৃহদারণ্যকোপনিষদের এক জায়গায় বলা হয়েছে, "মনেরই দ্বারা ব্রহ্ম অনুদ্রষ্টব্য। এতে কোন ভেদ নেই; যিনি এতে ভেদপ্রায় কিছু দেখেন, তিনি বার বার মৃত্যুর অধীন হন।" আসলে এই অংশ ব্রহ্ম যে এক, ব্রহ্ম যে সর্বত্র ব্যাপ্ত এই সত্যই ব্যক্ত করতে চায়। মুণ্ডকোপনিষদে এই ভাবই ব্যক্ত হয়েছে, যখন বলা হয়েছে "পুরোভাগে অবস্থিত এই সমস্ত অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মই, পশ্চাদ্ভাগে ব্রহ্ম, দক্ষিণে এবং উত্তরেও ব্রহ্ম, অধঃ ও ঊর্ধ্ব দিকেও ব্রহ্মই ব্যাপ্ত ; এই জগৎ এই প্রত্যক্ষ শ্রেষ্ঠতম ব্রহ্মই"। ব্রহ্ম এক অসীম সত্তা, অসংখ্য সান্ত বস্তুর সমষ্টি নয়। উপনিষদ যে কথা স্পষ্ট করে বলতে চায় তা হল যে, সৃষ্ট জগতের আত্মা থেকে স্বতন্ত্র কোন সত্তা নেই। উপনিষদ মতে বহুত্ব, পারম্পর্য, দেশে বস্তুর সহঅবস্থান, কার্যকারণ সম্পর্ক, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়র বিরোধ এগুলি পরমতত্ত্ব নয়। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে এগুলির কোন সত্তাই নেই। উপনিষদ মায়াবাদ এই অর্থে সমর্থন করে যে সব বস্তুর অন্তরালে এক পরম সত্তার অস্তিত্ব রয়েছে। যদিও জাগতিক বস্তু পরমতত্ত্বের অপরিপূর্ণ রূপ, তবু এরা ভ্রম মাত্র নয়। দ্বৈত বা বহুত্ব পরমতত্ত্ব নয়। অনেক সময় মানব মন জগতের স্ব-নির্ভর সত্তার কথা

চিন্তা করে। কিন্তু জগৎ স্ব-নির্ভর সত্তা নয়। সান্তকে অতিক্রম করে এক পরম তত্ত্বের অস্তিত্ব রয়েছে যাতে এই জগৎ বিধৃত—এই সত্যই মানুষ বিস্মৃত হয়। উপনিষদে কোথাও বলা হয়নি যে আমাদের চার পাশে যে সব বস্তু আমরা দেখি সেগুলি অলীক। উপনিষদ বলে, যা কালিক, তা কালহীন এক পরমতত্ত্বে বিধৃত। এই পরমতত্ত্বের ধারণা ছাড়া পরিবর্তন বোধগম্য নয়। জগৎ মিথ্যা ও ভ্রম মাত্র, এই সত্য উপনিষদের প্রতিপাদ্য সত্য নয়। হপকিনস্ (*Hopkins*)-ও মনে করেন যে বস্তুগত জগৎ ভ্রম মাত্র—প্রাচীন উপনিষদে এর কোন স্বীকৃতি খুঁজে পাওয়া যায় না।

উপনিষদের বিভিন্ন বচনে যে মূল ভাবধারাটি ব্যক্ত হয়েছে তা হল এই বিচিত্র জগৎ ব্রহ্মের প্রকাশ। উপনিষদের এই বচনগুলিতে ব্রহ্মের এই প্রকাশ যে ভ্রান্ত, তার কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। বিভিন্ন উপনিষদ থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতির সাহায্যে এই বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

ঈশোপনিষদের শুরুতেই বহু ও নানা দ্বারা খণ্ডিত জগৎকে ঈশ্বর বা ব্রহ্মের প্রকাশ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। 'ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ[1]। এই গতিশীল বিশ্বে যা কিছু পরিবর্তনশীল দেখি সবই ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদিত। [2]ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত'। এই সমস্ত জগৎ স্বরূপতঃ ব্রহ্মই। কারণ ব্রহ্ম থেকেই জগৎ জাত হয়, ব্রহ্মে লীন হয় ও ব্রহ্মে জীবিত থাকে। এখানে খণ্ডকে অস্বীকার করা হয়নি, খণ্ডকে ব্রহ্মেই স্থান দেওয়া হয়েছে। [3]ছান্দোগ্যোপনিষদের অন্যত্রও বলা হয়েছে, "হে সোম্য। চরাচর এই সমস্তই সৎ থেকে উৎপন্ন, সতে আশ্রিত ও সতে বিলীন হয়।" [4]শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলা হয়েছে, 'এই প্রকাশময়, বিশ্বস্রষ্টা ও সর্বব্যাপী ঈশ্বর সর্বদা প্রাণিগণের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছেন।' ঐ উপনিষদের অন্যত্র বলা হয়েছে, 'যে স্বয়ংপ্রকাশ দেব অগ্নিতে অবস্থিত, যিনি জলে অধিষ্ঠিত, যিনি ওষধিসমূহে প্রতিষ্ঠিত, যিনি বনস্পতিসমূহে বিরাজিত, যিনি নিখিল জগতে অনুপ্রবিষ্ট, সেই স্বয়ং প্রকাশকে বারংবার নমস্কার।' [5]বৃহদারণ্যকোপনিষদে

---

1. ২।২।১১ 2. ৩।১৪।১ 3. ৬।৮।৬ 4. ৪।১৭ 5. ৩।৭।১৫

বলা হয়েছে, 'যিনি সর্বভূতে অবস্থিত, যিনি সর্বভূতদেবতার অন্তর্বর্তী রূপে থাকেন, সর্বভূতদেবতা যাকে জানেন না, সর্বভূত যার শরীর, যিনি সর্বভূতের অন্তরে থেকে তাদের পরিচালিত করেন, তিনিই হলেন অন্তর্যামী ও অমৃত এবং আপনার আত্মা।' অনেকের মতে উপরিউক্ত বচনগুলি সর্বেশ্বরবাদ সমর্থন করে। তবে উপনিষদের প্রচারিত মতবাদ সর্বেশ্বরবাদ বলতে কি বোঝায় ভাল করে বুঝে নেওয়া দরকার।

সর্বেশ্বরবাদ অতিবর্তী ঈশ্বরবাদের বিরুদ্ধ মতবাদ। অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ অনুযায়ী ঈশ্বর জগতের সম্পূর্ণ বাইরে অবস্থান করেন। কিন্তু সর্বেশ্বরবাদ অনুযায়ী ঈশ্বর সম্পূর্ণভাবে জগতের অন্তঃস্থিত (wholly immanent) এবং জীব ও জগতের মধ্যেই ব্যাপ্ত। ঈশ্বরই সব কিছু এবং সব কিছুই ঈশ্বর। সব সান্ত সত্তা ঈশ্বরের পরম সত্তার মধ্যে নিঃশেষ হয়ে গেছে। ঈশ্বর-নিরপেক্ষ জগতের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই। উপনিষদে এমন বচন দেখা যায় যেখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে ঈশ্বর জগতের দ্বারা নিঃশেষিত হন না। উপনিষদ একথা বলে না যে ঈশ্বরই জগৎ, বরং বলেন যে জগৎ ঈশ্বরের মধ্যে। জগৎ ও ঈশ্বর অভিন্ন নয়। ঈশ্বর জীব জগতের ভিতরেও অবস্থিত (immanent) এবং বাইরেও অবস্থিত (transcendent)। সব কিছুই ঈশ্বর নয়, সব কিছু ঈশ্বরের মধ্যে। জীব জগতের সম্পর্কে ঈশ্বর অতিবর্তী আবার অন্তঃস্থিত। তাই রাধাকৃষ্ণন বলেন, সর্বেশ্বরবাদ পদটির মন্দ অর্থে উপনিষদ সর্বেশ্বরবাদী নয়। (The Upanisads are not pantheistic in the bad sense of the term)। [1]রাধাকৃষ্ণন যা বোঝাতে চান তা হল মন্দ অর্থে সর্বেশ্বরবাদ এক শূন্যগর্ভ অদ্বৈতবাদ, যা বহুকে উপেক্ষা করে এককে, এবং বিভেদকে উপেক্ষা করে ঐক্যকেই কেবলমাত্র স্বীকার করে। এ অর্থে তাহলে উপনিষদ সর্বেশ্বরবাদী দর্শন নয়। রাধাকৃষ্ণণ বলেন, 'এটা হল সর্বেশ্বরবাদ, যদি সর্বেশ্বরবাদ বলতে বুঝি ঈশ্বর আমাদের জীবনের মৌলিক সত্তা এবং আমরা তাঁকে ছাড়া বাঁচতে পারি না।[1] আসলে ব্রহ্ম সর্বব্যাপী, জীব ও জগতের মধ্যে ব্যাপ্ত, এই জগতের অন্তঃস্থিত সত্তা, এই অর্থেই উপনিষদ

---

1. *S. Radhakrishnan :* Indian Philosophy Vol. 1, P. 203

সর্বেশ্বরবাদী। [1]শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ব্রহ্মের সর্বব্যাপ্তি সম্বন্ধে এই উক্তি করা হয়েছে। তাঁর পানি এবং পাদ সর্বত্র। তাঁর অক্ষি, শির এবং মুখ সর্বত্র। তাঁর শ্রবণশক্তি সর্বত্র বর্তমান, তিনি সব বস্তুকে আবৃত করে বিরাজমান। এক পরমসত্তা সব কিছুকে ব্যাপ্ত করে বিরাজমান। ঈশ্বর বা ব্রহ্মই সবকিছু, সবকিছুই ঈশ্বর বা ব্রহ্ম,—এই মতবাদই সর্বেশ্বরবাদ। তাই অনেকে সিদ্ধান্ত করেন যে উপনিষদে মায়াবাদের বীজ থাকতে পারে। কিন্তু উপনিষদের মূল ভাবধারার সঙ্গে মায়াবাদের কোন সামঞ্জস্য নেই।

১৪। বন্ধন এবং মোক্ষ (Bondage and Liberation):

[2]কঠোপনিষদে বলা হয়েছে 'যা অবিদ্যা এবং যা বিদ্যা বলে খ্যাত, তারা উভয়ে অত্যন্ত বিভিন্ন এবং বিরুদ্ধ পথগামী।' নিত্য এবং অনিত্য বস্তুর মধ্যে অবিবেক হল অবিদ্যা। বিদ্যা হল এই উভয়ের বিবেক। অবিদ্যা হল ভিন্নতা, বহুত্বের এবং স্ব লক্ষণের জ্ঞান। বিদ্যা হল তাদাত্ম্যের অপরোক্ষ অনুভূতি। অবিদ্যা হল বন্ধনের কারণ। বিদ্যা হল বন্ধন থেকে মুক্তি।

[3]বৃহদারণ্যকোপনিষদে বলা হয়েছে, 'যারা অবিদ্যার উপাসনা করে তারা জ্ঞানপ্রতিবন্ধক অন্ধকারে প্রবেশ করে। যারা আবার বেদবিদ্যায় রত, তারা তার থেকেও অধিকতর অন্ধকারে প্রবেশ করে।'

বন্ধনের কারণ

উপনিষদ মতে অবিদ্যাবশতঃ জীব নিজেকে দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির সঙ্গে অভিন্ন গণ্য করে এবং বদ্ধদশা ভোগ করে। যখন জীব উপলব্ধি করে যে ব্রহ্ম থেকে সে স্বরূপতঃ অভিন্ন, তখনই সে যে প্রকৃতপক্ষে মুক্ত, বদ্ধ নয়, সে সম্পর্কে সচেতন হয়। অবিদ্যাপ্রসূত কর্ম কখনও মোক্ষপ্রদ হয় না। আত্মার জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের তাদাত্ম্যের উপলব্ধিই হল মোক্ষ।

প্রশ্ন হল কর্মের দ্বারা কি মোক্ষ লাভ করা যায়? কর্ম যে মোক্ষপ্রদ নয়, উপনিষদের বহু স্থলে তা ব্যক্ত করা হয়েছে। শাস্ত্রবিহিত কর্ম সারা জীবন

1. ৩।১৬ 2. কঠো, ১।২।৪ 3. বৃহ, ৪।৪।১০, ঈশো, ৯

ধরেই সম্পাদন করতে হবে। কিন্তু কর্ম অনিত্য। তার ফলও অনিত্য। কর্ম করলে স্বর্গলাভ হয়, যা অনিত্য। কর্ম সম্পাদনের মধ্য দিয়ে নিত্য ব্রহ্মকে কখনও লাভ করা যায় না।

কর্ম মোক্ষপ্রদ নয়

[1]কঠোপনিষদে বলা হয়েছে, 'কর্মফলস্বরূপ সম্পদ অনিত্য, কেন না অনিত্য দ্রব্যের দ্বারা সেই ধ্রুব বস্তুকে প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব।' উপনিষদে জ্ঞানরহিত কর্মের নিন্দা করা হয়েছে। [2]মুণ্ডকোপনিষদে বলা হয়েছে, 'যে অষ্টাদশ ব্যক্তিকে অবলম্বন করে জ্ঞানরহিত কর্ম বিহিত হয়েছে, যজ্ঞ-নির্বাহক সেই ষোড়শ ঋত্বিক্, যজমান ও যজমান-পত্নী এই অষ্টাদশ ব্যক্তিই বিনাশী কারণ তাঁরা অনিত্য। অতএব এই কর্মকে যে মূর্খরা শ্রেয়ো-লাভের উপায় বলে সমাদর করে তারা কিছুকাল স্বর্গ ভোগের পর পুনর্বার জরা-মৃত্যু প্রাপ্ত হয়।' ঐ [3]উপনিষদে অন্যত্র বলা হয়েছে নিত্য বস্তু মোক্ষ কর্ম দ্বারা উৎপন্ন হয় না। উপনিষদে আত্মজ্ঞানকেই মোক্ষপ্রাপ্তির উপায়রূপে নির্দেশ করা হয়েছে।[4]

আত্মজ্ঞানই মোক্ষ প্রাপ্তির উপায়

প্রশ্ন হল, আত্মজ্ঞান কিভাবে লাভ করা যায়? [5]কঠোপনিষদে বলা হয়েছে, 'এই আত্মাকে বহু বেদ আয়ত্ত করার ফলে অথবা ধারণাশক্তি সহায়ে কিংবা বহু শাস্ত্র শ্রবণের দ্বারাও জানা যায় না। অন্তর্যামিরূপে এই আত্মা যাকে অনুগ্রহ করেন, তিনিই একে লাভ করেন।' [6]বৃহদারণ্যকোপনিষদে বলা হয়েছে, 'শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা আত্মার দর্শন হয়'। আত্মাকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যায় না, তর্কের দ্বারা জানা যায় না। বিজ্ঞানের দ্বারাও জানা যায় না। একমাত্র অধ্যাত্মযোগের দ্বারাই আত্মাকে জানা যায়। মুণ্ডকোপনিষদে বলা হয়েছে, 'ব্রহ্ম চক্ষু দ্বারা গৃহীত হন না। বাক্যের দ্বারাও নহেন। আবার ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা অথবা অগ্নি হোত্রাদি কর্মের দ্বারাও গৃহীত হন না। বুদ্ধি নির্মল হলেই লোকে ব্রহ্ম জ্ঞানের যোগ্য হয়।' সন্ন্যাসোপনিষদে বলা হয়েছে ব্রহ্মাভ্যাস দ্বারাই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আত্মজ্ঞান লাভের উপায় সম্পর্কে বিভিন্ন উপনিষদের বক্তব্য

1. কঠো, ১।২।১০ 2. মুণ্ড, ১।২।৭ 3. মুণ্ড, ১।২।১২
4. মুণ্ড, ২।২।৫ 5. কঠো, ১।২।২৩, মুণ্ড, ৩।২।৩ 6. বৃহ, ২।৪।৫

[1]মুণ্ডকোপনিষদে বলা হয়েছে,' অবিচল সত্য, অবিরাম একাগ্রতা, নিত্য সম্যক আত্মদর্শন ও অটুট ব্রহ্মচর্যের দ্বারাই জ্যোতির্ময় শুদ্ধ আত্মাকে উপলব্ধি করা যায়।' বৃহদারণ্যকোপনিষদে বলা হয়েছে, 'যিনি কামনা পরতন্ত্র নন্, যিনি অকাম, নিষ্কাম, আপ্তকাম ও আত্মকাম ব্রহ্মস্বরূপ তিনি ব্রহ্মে লীন হন। [2]মুণ্ডকোউপনিষদেই বলা হয়েছে 'আত্মাকে অবগত হতে হলে সত্যদর্শীগণ জ্ঞান ছাড়া অন্য কিছুতেই তৃপ্ত হন না'। চুলিকোপনিষদে বলা হয়েছে, 'অজ্ঞানের নিরস হয়ে দিব্যদৃষ্টি না জন্মালে বাহ্যদৃষ্টিতে ভাবনার দ্বারা সেই অজর পরমাত্মাকে কেহ দর্শন করতে সমর্থ হয় না।' (চুলিকোপনিষদ ; ৪)

আত্মজ্ঞান লাভের জন্য নৈতিক চরিত্রের প্রয়োজনীয়তা

কোন্ ব্যক্তি মোক্ষ লাভের যোগ্য, সে সম্পর্কে উপনিষদের অভিমত বহু স্থলে ব্যক্ত করা হয়েছে। 'সাধারণভাবে বলা হয়েছে মুমুক্ষু ব্যক্তি অবশ্যই নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হবে। [3]কঠোপনিষদে বলা হয়েছে যে যে পাপাচরণ থেকে নিবৃত্ত হয়নি, ইন্দ্রিয়লোলুপতা থেকে বিরত হয়নি, একাগ্রচিত্ত হয়নি কিংবা সমাধির ফললাভ বিষয়ে ব্যাকুল তার মোক্ষলাভ হয় না।' [4]মুমুক্ষ ব্যক্তিকে আসক্তিশূন্য, উপরতেন্দ্রিয়, ধীর ও নিত্য সমাহিত হতে হবে। [5]মোক্ষ সত্যরূপ সাধনের দ্বারা লভ্য, [6]বিশুদ্ধ চিত্তের দ্বারা সূক্ষ্ম আত্মাকে জানা যায়। বুদ্ধি নির্মল হলেই লোকে ব্রহ্মজ্ঞানের যোগ্য হয়। কঠোপনিষদে বলা হয়েছে, "অন্তঃকরণাদি বিশুদ্ধ হলে নিষ্কাম ব্যক্তি তাকে দর্শন করে শোকাতীত হন।" [7]ঐ উপনিষদেই বলা হয়েছে যে, মানুষের হৃদয়ে যে সব কামনা আশ্রিত আছে তারা যখন বিশীর্ণ হয় তখন মর মানুষ অমর হয়।[8]

মোক্ষ কি শূন্যে বিলীন হয়ে যাওয়া? উপনিষদ মতে মোক্ষাবস্থায় ব্যক্তির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অবসান ঘটে। [9]মুণ্ডকোপনিষদে বলা হয়েছে, 'প্রবহমান নদীগুলি যেরূপ নাম ও রূপ ত্যাগ করে সাগরের সঙ্গে একতা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞও নাম ও রূপ থেকে বিমুক্ত হয়ে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন।'

1. মুণ্ডকো. ৩।১।৫ 2 মুণ্ডকো. ৩।২।৫ 3. কঠো. ১।২।২৪ 4. মুণ্ড. ৩।২।৫
5. মুণ্ডকো. ৩।১।৬ 6 মুণ্ডকো, ৩.১।৯ 7. কঠো. ১।২।২০ 8. কঠো. ২।৩।১৬
9. মুণ্ডকো. ৩।২।৮

[1] প্রশ্নোপনিষদেও বলা হয়েছে, 'প্রবহমান নদীগুলি সমুদ্রে উপস্থিত হলে অদৃশ্য হয়ে যায়, তাদের নাম ও রূপ বিনষ্ট হয় এবং তারা সমুদ্র নামেই নির্দিষ্ট হয়, ঠিক সেরূপ মোক্ষপ্রাপ্ত ব্যক্তিও ব্রহ্মে লীন হয়ে যান তার নাম ও রূপ বিনষ্ট হয়।' মুণ্ডকোপনিষদে বলা হয়েছে, 'সাক্ষাৎকামী সাধক যখন স্বুবর্ণবর্ণ, জগৎকর্তা, পরমেশ্বর, পরিপূর্ণস্বরূপ ও জগৎকারণ ব্রহ্মকে দর্শন করেন তখন সেই বিদ্বান, পুণ্য ও পাপ সমূলে নাশ করে বিগতক্লেশ হন এবং পরম সাম্য প্রাপ্ত হন।'[2] উপনিষদ জীবাত্মাকে পরমতত্ত্ব মনে করে না। যারা ব্যক্তিগত অমরতার যাচ্ঞা করে তারাই জীবাত্মাকে পরমতত্ত্ব মনে করে। মোক্ষাবস্থা সকল প্রকার ভয় থেকে মুক্তি। ব্রহ্মসম্বন্ধী আনন্দকে যিনি জানেন তিনি সর্ব ভয়ের কারণ থেকে মুক্ত হন।[3] মোক্ষ হল পরমাত্মার সঙ্গে একীভূত হওয়া। [4]মুণ্ডকোপনিষদে বলা হয়েছে, 'সন্ন্যাস যোগাবলম্বনে যাঁরা বিশুদ্ধচিত্ত হয়েছেন এবং যাঁরা যত্নশীল, তাঁরা সকলে জীবিত অবস্থাতেই ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মভূত হয়ে চরম দেহত্যাগকালে সর্বত্র নির্বাণপ্রাপ্ত হন।' মোক্ষাবস্থায় একত্বদর্শীর কোন মোহ বা শোক থাকে না। [5]ঈশোপনিষদে বলা হয়েছে, 'জ্ঞানীর যে আত্মায় সমুদয় বস্তু আত্মরূপে এক হয়ে যায়, সেই একত্বদর্শীর আত্মার মোহই বা কি, আর শোকই বা কি?' [6]কঠোপনিষদে বলা হয়েছে, "ধীর ব্যক্তি সেই সনাতন ও স্বপ্রকাশ আত্মাকে অধ্যাত্মযোগ-সহায়ে সাক্ষাৎ করে হর্ষশোক ত্যাগ করেন।" মোক্ষ যে আনন্দের অবস্থা কঠোপনিষদে তা ব্যক্ত হয়েছে। "[7]আত্মাকে প্রাপ্ত হয়ে মানুষ আনন্দের আকরকে লাভ করে আনন্দই উপভোগ করে।" ঐ উপনিষদেরই অন্যত্র বলা হয়েছে যে বিবেকী ব্যক্তিগণ যখন আত্মাকে দর্শন করেন তখন তাঁদের শাশ্বত সুখ হয় (তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্), অপরদের নয়।

[8]কঠোপনিষদের অন্যত্রও বলা হয়েছে যে নিষ্কাম ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরা আত্মাকে প্রাপ্ত হয়ে যে পরম সুখের অধিকারী হন তা অনির্দেশ্য।

---

1. প্রশ্নো, ৬।৫ 2. মুণ্ড, ৩।১।৩ 3. তৈত্তি, ২।৯ 4. মুণ্ড, ৩।২।৬
5. ঈশো, 6. কঠো, ১।২।১২ 7. কঠো, ১।২।১৩, ২।১।১২-১৩ 8. কঠো, ২।২।১৪

ব্যক্তি জীবিত অবস্থাতেই যে মোক্ষলাভ করতে পারে, মুণ্ডকোপনিষদে সে কথা বলা হয়েছে। 'হে সোম্য, এই পরম, অমৃত ও সর্বস্বরূপ ব্রহ্মকে যিনি সব প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থিত বলে জানেন তিনি জীবিতাবস্থাতেই অবিদ্যাগ্রন্থি ছেদন করেন বা অবিদ্যা বাসনাকে বিনাশ করেন।"[1]

১৫। আধ্যাত্মিক উপলব্ধির পথে স্তর (Steps in spiritual realisation) :

উপনিষদে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির পথে পাঁচটি স্তরের উল্লেখ করা হয়েছে। এই পাঁচটি স্তর নীচে আলোচনা করা হচ্ছে :

আধ্যাত্মিক উপলব্ধির প্রথম স্তরে সাধক নিজেকে অপরের থেকে স্বতন্ত্র মনে করার জন্য যোগজ অপরোক্ষানুভূতির মাধ্যমে পরমতত্ত্বকে নিজের মধ্যেই অনুভব করেন। [2]বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে, "হৃদয়ই এই প্রজাপতি, উহা ব্রহ্ম, উহা সমস্ত। [3]কঠোপনিষদে বলা হয়েছে।" অন্তরাত্মা পুরুষ সর্বজনের হৃদয়ে সর্বদা অবস্থিত আছেন।" [4]কঠোপনিষদের অন্যত্র বলা হয়েছে, "এই আত্মা প্রত্যেক জীবের হৃদয়গুহার মধ্যে অবস্থিত।" [5]ছান্দোগ্যোপনিষদে বলা হয়েছে, "হৃদয়-পদ্মমধ্যে অবস্থিত আমার আত্মাই পৃথিবী থেকে বিশালতর।"

দ্বিতীয় স্তরে সাধক অনুভব করে সাধক স্বরূপতঃ আত্মস্বরূপ। [6]কঠোপ-নিষদে বলা হয়েছে, "মানুষ এই আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করে এবং (আমিই আত্মা এই ভাবে) তাকে সম্যক্ গ্রহণ করে ধর্ম থেকে অনপেত সূক্ষ্ম আত্মাকে প্রাপ্ত হন।"

তৃতীয় স্তরে সাধক অনুভব করে যে, যে আত্মার উপলব্ধি তার হয়েছে সেই আত্মাই ব্রহ্ম। [7]বৃহদারণ্যকোপনিষদে বলা হয়েছে, "পাঁচটি পঞ্চজন এবং অব্যাকৃত যাঁতে প্রতিষ্ঠিত, সেই আত্মাকেই আমি আমার ব্রহ্ম বলে মনে করি।' [8]ছান্দোগ্যোপনিষদে বলা হয়েছে,'যিনি সর্বকর্মা, সর্বকাম, সর্বগন্ধ. সর্বরস, তিনি সর্বব্যাপী হয়ে বিদ্যমান ; তিনি ইন্দ্রিয়শূন্য ও আগ্রহবিবর্জিত ; ইনিই হৃদয়পদ্ম

---

1. মুণ্ডকো. ২।১।১০ 2. বৃহদা, ৫।৩।১ 3. কঠো, ২।৩।১৭ 4. কঠো, ১।২।২০
5. ছান্দোঃ, ৩।১৪।৩ 6. কঠো, ১।২।১৩ 7. বৃহদা, ৪।৪।১৭ 8. ছান্দো. ৩।১৪।৪

মধ্যে অবস্থিত আমার আত্মা। ইনি ব্রহ্ম। [1]বৃহদারণ্যকোপনিষদে বলা হয়েছে। "এই পৃথিব্যাদি চতুষ্টয় তিনিই, যিনি আত্মা ; এই আত্মজ্ঞান অমৃত। ইনি ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মজ্ঞানই সব।" [2]মাণ্ডুক্যোপনিষদে বলা হয়েছে, এই সমস্তই ব্রহ্ম ; এই আত্মা ব্রহ্ম।"[3] ছান্দোগ্যোপনিষদে অন্যত্র বলা হয়েছে, "ইনিই আত্মা ; ইনিই অমৃত, অভয়, ইনিই ব্রহ্ম।" [4]তৈত্তিরীয়োপনিষদে বলা হয়েছে, "উক্ত মহই ব্রহ্ম এবং উহাই আত্মা।" [5]বৃহদারণ্যকোপনিষদে বলা হয়েছে, এই সর্বানুভবকারী আত্মা ব্রহ্মই। এই হল সব বেদান্তের উপদেশ। 'স বা অয়মাত্মা ব্রহ্ম'। যিনি আত্মা তিনি অবশ্যই ব্রহ্ম (বৃহ. ৪।৪।৫) ঐতরেয় উপনিষদে বলা হয়েছে, "জীবের মোহনিদ্রা যখন ভেঙ্গে যায় তখন সে সর্বব্যাপী পরমেশ্বরকে দেখতে পায়। তখন সে বুঝতে পারে যে তার হৃদয়ে যে পুরুষ বাস করছে সেই পুরুষই সর্বব্যাপী ব্রহ্ম। তখন সে কৃতার্থ হয়ে বলে, 'আমি আমার আত্মস্বরূপকে দেখলাম (ঐত. ১।৩।১৩)।

চতুর্থ স্তরে সাধক উপলব্ধি করে যে তিনি যেহেতু স্বরূপতঃ আত্মা এবং আত্মাই ব্রহ্ম, সুতরাং তিনিই ব্রহ্ম। [6]ছান্দোগ্যোপনিষদে বলা হয়েছে, "স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো।" অর্থাৎ 'সেই যে সদাখ্য সূক্ষ্ম কারণ তাঁর দ্বারাই এই সমস্ত জগৎ আত্মবান; তিনি পরমার্থ সত্য, তিনি আত্মা। হে শ্বেতকেতু, তুমি সেই সৎ'। [7]বৃহদারণ্যকোপনিষদে বলা হয়েছে, "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি"। অর্থাৎ 'ব্রহ্মস্বরূপ তিনি ব্রহ্মেই লীন হন।'

পঞ্চম স্তরে সাধকের এই উপলব্ধি হয় যে সবই ব্রহ্ম। [8]ছান্দোগ্যপনিষদে বলা হয়েছে, "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত।" অর্থাৎ এই সমস্ত জগৎ স্বরূপতঃ ব্রহ্মই, কারণ তাঁর থেকেই উহা জাত হয়, তাঁতেই লীন হয় ও তাঁতে জীবিত থাকে। অতএব শান্ত হয়ে উপাসনা করবে।

---

1. বৃহদা, ২।৫।১ 2. মাণ্ডুক্যো, ২ 3. ছান্দোগ্য ৮।৩।৪ 4. তৈত্তি, ১।৫।১
5. বৃহদা, ২।৫।১৯ 6. ছান্দোগ্য, ৬।৮।৭ 7. বৃহদা, ৪।৪।৬ 8. ছান্দোগ্য ৩।১৪।১

১৬। আধ্যাত্মিক উপলব্ধির প্রকৃতি ও পরিণাম (Characteristics and consequenses of mystic realisation) ঃ

উপনিষদে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির প্রকৃতি ও পরিণাম ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

বৃহদারণ্যকোপনিষদে বলা হয়েছে যে ব্যক্তির যখন আত্মোপলব্ধি ঘটে তখন তার কামনার পরিতৃপ্তি ঘটে এবং অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। তখন তার শারীরিক কর্ম করার কোন প্রয়োজন নেই। তাই বলা হয়েছে 'কেহ যদি পরমাত্মাকে 'আমি ইনি' এরূপ জানেন, তবে তিনি কোন বস্তুর কামনায় (এবং) কার প্রয়োজনে শরীরের দুঃখে দুঃখী হবেন?[1] ব্যক্তির যখন আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ঘটে তখন তার সব শারীরিক দুঃখ এবং কামনার ধ্বংস ঘটে। আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ঘটলে ব্যক্তির সব সংশয় এবং ভ্রান্তি দূরীভূত হয়। আত্মোপলব্ধির পর ব্যক্তির সব সমস্যার সমাধান ঘটে। [2]মুণ্ডকোপনিষদে বলা হয়েছে যে 'আত্মোপলব্ধি ঘটলে ঐ সাক্ষাৎকারীর হৃদয়ের গ্রন্থি বিনষ্ট হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয় এবং কর্মসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।'

আত্মোপলব্ধি ব্যক্তিকে অসীম শক্তিরও অধিকারী করে। মুণ্ডকোপনিষদে বলা হয়েছে যে জীবাত্মা ও পরমাত্মা একই শরীরকে আলিঙ্গন করে আছে। কিন্তু জীবাত্মা আসক্তির জন্য দীনভাব প্রাপ্ত হয় এবং দুশ্চিন্তা সহকারে সন্তাপ করে থাকে। কিন্তু সাক্ষাৎকামী সাধক যখন ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেন তখন তিনি বীতশোক হন, তিনি বিগতক্লেশ হন এবং পরমসাম্য প্রাপ্ত হন। আত্মোপলব্ধি সাধককে দেয় এক পরম আনন্দ। সাধক সর্বভয়ের কারণ থেকে মুক্ত হন। তৈত্তিরীয় উপনিষদে এই আনন্দের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। ঐ উপনিষদে বলা হয়েছে, আনন্দই ব্রহ্ম। আনন্দ থেকেই ভূতগণ জন্মায়। জন্মাবার পর আনন্দের দ্বারাই বেঁচে থাকে এবং পরিশেষে আনন্দে প্রতিগমন ও প্রবেশ করে। যিনি এভাবে ব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হন। এই আনন্দ লাভের প্রথম পরিণাম হল সর্বপ্রকার ভীতি দূরীভূত হওয়া। [3]তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে সাধক অভয় প্রাপ্ত হয় কেননা সাধক

1. বৃহদা. ৪।৪।১২ 2. মুণ্ডকো, ২।২।৮ 3. ২।৭

দর্শনাতীত, অশরীর, অনির্বাচ্য, নিরাধার বস্তুতে (ব্রহ্মে) স্থিতিলাভ করে। সর্বশেষে আত্মোপলব্ধি লাভের ফলে সাধকের সর্ব কামনা সিদ্ধ হয়। [1]ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে, 'যিনি শাস্ত্র ও আচার্যের কাছ থেকে আত্মার পরিচয় লাভ করে তদনুযায়ী তাকে বিশেষরূপে অনুভব করেন, তিনি সমস্ত লোক ও সমস্ত কাম্য লাভ করেন। কাজেই দেখা যায় আত্মোপলব্ধির ফলে সাধকের সব জাগতিক কামনা সিদ্ধ হয়, সব সংশয় দূরীভূত হয় ; সাধক অসীম শক্তির অধিকারী হয়, অসীম আনন্দ লাভ করে, অভয়প্রাপ্ত হয় ও সমস্ত কাম্য-বস্তু লাভ করে। উপনিষদ মতে আত্মোপলব্ধিই জীবনের পরম লক্ষ্য। কারণ আত্মাই ব্রহ্ম। ব্রহ্মকে পরমতত্ত্ব মনে করলেই, উপনিষদের দর্শনের ভিত্তিতে সর্বশ্রেষ্ঠ নীতিতত্ত্ব গড়ে তোলা যেতে পারে। আত্মসুখবাদ ও পরসুখবাদের সমন্বয়, আত্মার স্বাধীনতা, ভালত্ব, মন্দত্ব নির্ণয় সবই অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে যদি আত্মাকেই পরমতত্ত্ব মনে করা হয়। অবিদ্যাবশতঃ মানুষ ব্রহ্মই যে পরমতত্ত্ব, তা বিস্মৃত হয়। তত্ত্বজ্ঞানের বা ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা এই অবিদ্যা দূরীভূত করতে পারাই হল উপনিষদের লক্ষ্য। জ্ঞানের দ্বারাই ব্যক্তি সকল প্রকার দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করে।

১৭ : পরাবিদ্যা এবং অপরাবিদ্যা :

উপনিষদে দুই প্রকার জ্ঞান বা বিদ্যার মধ্যে প্রভেদ করা হয়েছে—উচ্চতর জ্ঞান বা পরাবিদ্যা এবং নিম্নতর জ্ঞান বা অপরাবিদ্যা। [2]মুণ্ডকোপনিষদে বলা হয়েছে ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ এবং অথর্ববেদ এই চারটি বেদ এবং শিক্ষা (বর্ণের উচ্চারণ), কল্পসূত্র, ব্যাকরণ, নিরুক্ত (বৈদিক শব্দের অর্থ প্রকাশক গ্রন্থ), ছন্দঃ ও জ্যোতির্বিজ্ঞান—এই ছটি বেদাঙ্গ হল অপরাবিদ্যা। 'যাবতীয় ব্যবহারিক বিজ্ঞান ও কলা এবং নশ্বর পদার্থ ও ভোগ্যবস্তু সম্বন্ধীয় শাস্ত্রীয় জ্ঞান' অপরাবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। লক্ষ্য করার বিষয় যে বেদকেও অপরাবিদ্যা বলা হয়েছে। যে বিদ্যা দ্বারা অক্ষর ব্রহ্মকে জানা যায় তাই পরাবিদ্যা। যার জ্ঞানে অশ্রুত বিষয় শ্রুত হয়, অচিন্তিত বিষয় সুচিন্তিত হয় ও অনিশ্চিত বিষয়

1. ৮।২।১   2. মুণ্ড, ১।১।৪

সুনিশ্চিত হয় তাই পরাবিদ্যা।[1] চরমতত্ত্ব অর্থাৎ পরমাত্মার জ্ঞানের তুলনায় নিম্নতর জ্ঞানকে অবিদ্যা নামে অভিহিত করা যেতে পারে। [2]কঠোপনিষদে বলা হয়েছে, 'যা অবিদ্যা এবং যা বিদ্যা বলে খ্যাত তারা উভয়ে বিভিন্ন ও বিরুদ্ধ পথগামী।' শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলা হয়েছে পরব্রহ্মে বিদ্যা ও অবিদ্যা প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত আছে। অবিদ্যা সংসার গতির কারণ এবং বিদ্যা অমৃতত্ত্ব লাভের হেতু। [3]কঠোপনিষদে বলা হয়েছে, 'পরমাত্মা বাক্যের দ্বারা অবগত হন না, মনের দ্বারা নয়, চক্ষুর দ্বারাও নয়।' সাধারণ বিদ্যার দ্বারা পরমাত্মাকে জানা যায় না। পরমাত্মা বা ব্রহ্মকে জানার জন্য ব্রহ্মবিদ্ গুরুর উপদেশ প্রয়োজন। মুণ্ডকোপনিষদে বলা হয়েছে, 'ব্রহ্মজ্ঞ গুরু যথাবিধি সমীপাগত, প্রশান্তচিত্ত, সংযতেন্দ্রিয় শিষ্যকে যার দ্বারা সত্যস্বরূপ অক্ষর পুরুষকে জানা যায় সেই ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ে যথাযথরূপে উপদেশ প্রদান করেন'।

১৮। উপনিষদের নীতিতত্ত্ব (The Ethics of the Upanisads):

কীথের অভিমত

কীথ প্রভৃতি পণ্ডিতদের মতে উপনিষদে নৈতিক আচরণ সম্পর্কে যে আলোচনা সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে তা অকিঞ্চিৎকর ও মূল্যহীন। কিন্তু এই জাতীয় অভিমতের সত্যতা স্বীকার করা চলে না। বিভিন্ন উপনিষদ থেকে উদ্ধৃতির সাহায্যে উপরিউক্ত অভিমত যে যথার্থ নয় তা দেখানো যেতে পারে।

উপনিষদের নীতিতত্ত্বের আলোচনায় উপনিষদের লক্ষ্যের কথা বিস্মৃত হলে চলবে না। উপনিষদের লক্ষ্য হল জীবের ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মতা লাভ।[4]

উপনিষদের লক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে উপনিষদের নীতিতত্ত্বের আলোচনা

উপনিষদের ঋষি বলেছেন 'যিনি সর্বকর্মা, সর্বকাম, সর্বগন্ধ, সর্বরস, তিনি সকল কিছু ব্যাপ্ত হয়ে বিদ্যমান। তিনি ইন্দ্রিয়শূন্য ও আগ্রহবিবর্জিত। ইনিই হৃদয়পদ্ম মধ্যে অবস্থিত আমার আত্মা। ইনি ব্রহ্ম। দেহত্যাগের পর আমি একেই পাব'। মানুষ যা নয় তা হবার প্রচেষ্টাকে উপনিষদে আদর্শরূপে গণ্য

---

2. ছান্দোগ্য, ৬।১।৩ 3. কঠো, ১।২।৪ 4. কঠো, ২।৩।১২ 4. ছান্দোগ্য, ৩।১৪।৪

করা হয়নি। যে ব্রহ্মের সঙ্গে জীব স্বরূপতঃ অভিন্ন, সেই ব্রহ্মকে লাভ করাই উপনিষদের মতে প্রতিটি জীবের আদর্শ। [1]প্রশ্নোপনিষদে বলা হয়েছে, 'পক্ষীরা যেমন তাদের বাসবৃক্ষের দিকে ধাবিত হয়, ঠিক তেমনি বক্ষ্যমাণ সব পদার্থ অক্ষর পুরুষে সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত হয়। [2]তৈত্তিরীয়োপনিষদে দেখতে পাই ঋষির প্রার্থনা 'হে দেব আমি যেন অমরত্বের কারণ ব্রহ্মজ্ঞানের আধার হতে পারি।' উপনিষদের লক্ষ্যের কথা বলতে গিয়ে ঐ উপনিষদেই বলা হয়েছে, 'তিনি স্বরাজ্য প্রাপ্ত হন এবং মনসম্পতিকে প্রাপ্ত হন। তিনি আকাশ-শরীর, সত্যাত্মা, প্রাণারাম, মন-আনন্দ, শান্তিসমৃদ্ধ ও অমৃত ব্রহ্ম হন।' উপনিষদে যে নীতিতত্ত্বের সঙ্গে আমরা পরিচিত হই তা এই লক্ষ্যের অধীনস্থ।

আত্মোপলব্ধিই পরম কল্যাণ

উপনিষদে মানুষের পরমকাম্য বস্তুকে আত্মপোলব্ধি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। [3]কঠোপনিষদে বলা হয়েছে, 'বিবেকিগণ অনিত্য বস্তু সমূহের মধ্যে কূটস্থ নিত্যস্বরূপকে অবগত হয়ে এই জগতে কিছু কামনা করেন না। [4]ছান্দোগ্যোপনিষদে বলা হয়েছে, যা ভূমা, তাই সুখ, অল্পে সুখ নেই, ভূমাই সুখ।' (যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং)। কঠোপনিষদে বলা হয়েছে, 'প্রমাদ-কারী অজ্ঞান সমাচ্ছন্ন অবিবেকীর কাছে পরলোক প্রাপ্তির শাস্ত্রীয় সাধন প্রকটিত হয় না। 'কেবল এই দৃশ্যমান ভোগায়তন লোকই আছে। পরলোক নেই'—এই মনে করে মানুষ পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর অধীনতা প্রাপ্ত হয়।

উপনিষদে নৈতিকতার বাহ্য দিকের উপর গুরুত্ব আরোপ না করে, অভ্যন্তরীণ দিকের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বাহ্য সংগতির তুলনায় অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। চুরি করো না, হত্যা করো না, উপনিষদ শুধু একথা বলে না, উপনিষদ বলে, কামনা করো না, ঘৃণা করো না, ক্রোধ, হিংসা ও লোভের আশ্রয় নিও না।

উপনিষদ স্বার্থপুষ্ট প্রচেষ্টা বর্জন করতে বলে, সব স্বার্থ বর্জন করতে বলে

1. প্রশ্নো, ৪।৭ 2 তৈত্তি, ১।৪ ; ১।৬।২ 3. কঠো, ২।১।২ 4. ছান্দোগ্য, ৭।২৩।১

না। কামনা দূষনীয় নয়, স্বার্থদুষ্ট কামনাই দূষনীয়। [1]বৃহদারণ্যকোপনিষদে বলা হয়েছে, 'জীব ইহলোকে যা কিছু কর্ম করে, (পরলোকে) সেই কর্মের ভোগ শেষ করে পুনরায় কর্ম করার জন্য পরলোক থেকে ইহলোকে আসে।' যে ফলাকাঙ্ক্ষী তার এরূপ হয়। পরন্তু যিনি কামনা পরতন্ত্র নন্—যিনি অকাম নিষ্কাম, আপ্তকাম ও আত্মকাম তার ইন্দ্রিয়গুলি সাধারণ ব্যক্তির মতন দেহ থেকে উৎক্রমণ করে না। ব্রহ্মস্বরূপ তিনি ব্রহ্মেই লীন হন।' কামনা মাত্রই খারাপ নয়, মোক্ষ এবং জ্ঞানের জন্য আকাংঙ্খা সর্বোতভাবে সমর্থনযোগ্য।

উপনিষদ সব স্বার্থ বর্জ্জন করতে বলে না

উপনিষদে মানুষের সকল রকম আবেগের নিন্দা করা হয়নি। মানুষকে অহংকার, লালসা প্রভৃতি বর্জ্জন করতে বলা হয়েছে। কিন্তু ভালবাসা, দয়া, সহানুভূতি প্রভৃতি কোমল আবেগ বর্জ্জন করতে বলা হয়নি। উপনিষদে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির জন্য তপস্যার উল্লেখ[2] করা হয়েছে। সর্বজ্ঞত্বই হল তপস্যা। তপস্যা হল আত্ম-শক্তির বিকাশ, দেহের ক্রীতদাসত্ব থেকে আত্মার মুক্তি। [3]ছান্দোগ্যপনিষদে বলা হয়েছে, শ্রদ্ধাই তপ। ঈশোপনিষদে বলা হয়েছে, 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা 'অর্থাৎ ত্যাগের দ্বারা আত্মাকে পালন কর।'

উপনিষদে সব আবেগ বর্জ্জন করতে বলা হয়নি

ত্যাগের দ্বারা আত্মাকে পালন করা দরকার

উপনিষদ কাজ করার কথা বলে, কিন্তু অনাসক্তভাবে কাজ করার কথা বলে। [4]বৃহদারণ্যকোপনিষদে বলা হয়েছে, 'ভূতবর্গের জন্যই যে ভূতবর্গ প্রিয় হয়; তা নয়। আত্মার জন্যই ভূতগণ প্রিয় হয়। সর্ববস্তুর জন্যই যে সর্ববস্তু প্রিয় হয় তা নয়। আত্মার জন্যই সর্ববস্তু প্রিয় হয়।'

উপনিষদ আধ্যাত্মিক সংগ্রামের জন্য দৈহিক প্রস্তুতির কথা বলে। শৌচ, ব্রত, সন্তোষ প্রভৃতি শারীরিক শুদ্ধতা হিসেবে উপদিষ্ট হয়েছে। [5]ছান্দোগ্য

1. বৃহদা. ৪।৪।৬ 2. মুণ্ডকো.. ১।১।৯ 3. ছান্দোগ্য. ৫।১০।১-২
4. বৃহদা. ২।৪।৫ 5. ছান্দোগ্য. ৮।৫।১

উপনিষদে বলা হয়েছে, 'লোকে যাকে যজ্ঞ বলে তাও ব্রহ্মচর্য্য ; কারণ যিনি জ্ঞাতা তিনি ব্রহ্মচর্য্য দ্বারাই ব্রহ্মলোক লাভ করেন। উপনিষদ কর্ম বর্জন করে সংসার পরিত্যাগ করার কথা বলে না। [1]ঈশোপনিষদে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি এই জগতে শত বৎসর বেঁচে থাকতে উৎসুক, তিনি শাস্ত্রবিহিত কর্ম করেই বাঁচতে ইচ্ছা করবেন।'

আধ্যাত্মিক সংগ্রামের জন্য দৈহিক প্রস্তুতি

উপনিষদে নৈতিক আদর্শ লাভের জন্য কতকগুলি কর্তব্য বা সৎ গুণ অনুশীলনেব কথা বলা হয়েছে। [2]বৃহদারণ্যকোপনিষদে বলা হয়েছে, দম, দান ও দয়া এই তিনটি শিক্ষা করা উচিত। [3]তৈত্তিরীয়োপনিষদে বলা হয়েছে সত্য বলবে, ধর্মানুষ্ঠান করবে। সত্য থেকে বিচ্যুত হবে না। ধর্ম থেকে বিচ্যুত হবে না। [4]ছান্দোগ্যোপনিষদে তপস্যা, দান, সরলতা, অহিংসা ও সত্যবাদিতাকে যথার্থ আচরণরূপে অভিহিত করা হয়েছে।

নৈতিক আদর্শ লাভের জন্য সৎগুণ অনুশীলনেব প্রয়োজনীয়তা

[5]কঠোপনিষদে বলা হয়েছে বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন, সংযতমনা ও পবিত্র ব্যক্তি সংসারমার্গের অতীত বস্তু প্রাপ্ত হন। মুণ্ডকোপনিষদে বলা হয়েছে ব্রহ্মজ্ঞ গুরু প্রশান্তমনা ও সংযেতন্দ্রিয় শিষ্যকেই ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দেবেন।[6] ঐ উপনিষদের অন্যত্র বলা হয়েছে, সত্য, তপস্যা সম্যগ্ জ্ঞান ও ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারাই আত্মাকে লাভ করা যায়[7]। তৈত্তিরীয়োপনিষদে ব্রহ্মজিজ্ঞাসুকে বাহ্যেন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় সংযত করতে বলা হয়েছে[8]।

১৮। মনোবিজ্ঞান (Psychology) ঃ

যদিও উপনিষদে কোন সুসংহত মনোবৈজ্ঞানিক লক্ষ্য বিশ্লেষণ করা যায় না তবু উপনিষদে যে সব মনোবৈজ্ঞানিক ধারণা গ্রহণ করা হয়েছে তার কিছুটা আভাস আমরা পেতে পারি। [9]প্রশ্নোপনিষদে দশটি ইন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় এবং পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়র উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। এই সমস্ত ইন্দ্রিয় মনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। মন হল প্রধান ইন্দ্রিয়, দর্শন ও

মন প্রধান ইন্দ্রিয়

1. ঈশো, ২ 2 বৃহদা, ৫।৩।১ 3. তৈত্তী, ১।৯ 4. ছান্দো. ৩।১৭।৪ 5. কঠো, ১।৩।৯
6. মুণ্ড, ১।২।১৩ 7. মুণ্ড, ৩।১।৫ 8. তৈত্তি, ১।৯ 9. প্রশ্নো. ৪।৮

ক্রিয়া যার প্রধান কাজ। মন ছাড়া ইন্দ্রিয়গুলি অর্থহীন। [1]বৃহদারণ্যকোপনিষদে বলা হয়েছে, 'মনেরই দ্বারা লোক দর্শন করে, এবং মনের দ্বারা শ্রবণ করে। কাম, সংকল্প, সংশয়, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৃতি, অধৃতি, লজ্জা, প্রজ্ঞা, ভয় ইত্যাদি সমস্তই মন। মন আছে বলেই পশ্চাদ্দিক থেকে স্পৃষ্ট হলেও লোকে মনের সহায়ে বিবেকপূর্বক তা জানতে পারে।' মনকে জড় হিসেবে গণ্য করা হত। উপনিষদ মতে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের জন্য শুধুমাত্র ইন্দ্রিয় বা তার ক্রিয়া হলেই চলবে না, এক আত্মার প্রয়োজন যে আত্মা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করে। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সন্নিকর্ষই প্রত্যক্ষ। এক সময়ে একটিমাত্র কাজ করা যেতে পারে। বুদ্ধি মনের থেকে উচ্চতর। [2]ঐতরেয়োপনিষদে বুদ্ধির বিভিন্ন ক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে। চেতনভাব, প্রভুত্বভাব, কলা-বিজ্ঞান, প্রতিভা, ধারণাশক্তি, বিষয়োপলব্ধি, ধৈর্য্য, চিন্তা, চিন্তাবিষয়ে স্বাতন্ত্র্য, রোগাদিজনিত দুঃখ, স্মৃতি, নিশ্চয়, অধ্যবসায়, প্রাণাদি-বৃত্তি, বিষয়তৃষ্ণা, মনোজ্ঞ বস্তুর স্পর্শ কামনা সবই প্রজ্ঞানস্বরূপ আত্মার ঔপাধিক, নামমাত্র। অবশ্য এই ঔপনিষদিক বিশ্লেষণ সমালোচনার অতীত নয়। কিন্তু বিষয়টি এইদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে উপনিষদের সময়েও মনোবৈজ্ঞানিক আলোচনার অবকাশ ছিল।

বুদ্ধির বিভিন্ন ক্রিয়া

কিন্তু সকলের উপরে হল আত্মার স্থান। আত্মা হল চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র। আত্মাই বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়, প্রাণ সকল কিছুকে নিয়ন্ত্রিত করে। [3]বৃহদারণ্য-কোপনিষদে বলা হয়েছে, 'আত্মা কোনটি'? বলা হয়েছে, 'এই যিনি বুদ্ধিতে উপহিত, ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে অবস্থিত এবং বুদ্ধির অভ্যন্তরস্থ স্বয়ং জ্যোতি পুরুষ। [4]কঠোপনিষদে ও মুণ্ডকোপনিষদে[5] আত্মাকে সুবিশাল ও সর্বব্যাপী বলা হয়েছে। উপনিষদে কোথাও কোথাও আত্মায় জড়ধর্ম আরোপিত হয়েছে এবং হৃদয়গুহায় অবস্থিত এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। [6]বৃহদারণ্যকোপনিষদে এই আত্মাকে যবের সদৃশ

আত্মা সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে

1. বৃহদা ১।৫।৩ 2. ঐতরে. ৩।১।২ 3. বৃহদা. ৪।৩।৭ 4. কঠো, ১।২।২২
5. মুণ্ড, ১।১।৬ 6. বৃহদা. ৫।৬।১

পরিমাণবিশিষ্ট বলে বর্ণনা করা হয়েছে। [1]ছান্দোগ্যোপনিষদে বলা হয়েছে 'হৃদয় পদ্মমধ্যে অবস্থিত উক্ত গুণবিশিষ্ট আমার এই আত্মাই ব্রীহি, যব, সর্ষপ শ্যামাক কিংবা শ্যামাকতণ্ডুল অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর।' [2]শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে আত্মাকে অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ বলা হয়েছে। উপনিষদ মতে আত্মার অবস্থান হল হৃদয়পদ্মে।

মন চেতনার থেকে ব্যাপক। [3]মাণ্ডুক্যোপনিষদে আত্মার বিভিন্ন অবস্থার কথা বলা হয়েছে। জাগ্রদবস্থা, স্বপ্নাবস্থা, সুষুপ্তি এবং তুরীয়। জাগ্রদবস্থায় মন এবং ইন্দ্রিয়সকল সক্রিয় থাকে। স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয়গুলি সক্রিয় থাকে এবং মনের মধ্যে হারিয়ে যায়, যে বিষয়টি আধুনিক মনোবিজ্ঞান অস্বীকার করে। উপনিষদ মতে যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের ইন্দ্রিয় সক্রিয় থাকে আমরা তন্দ্রাচ্ছন্ন থাকি, স্বপ্ন দেখিনা। আমরা অর্দ্ধ-জাগ্রত অবস্থায় থাকি। প্রকৃত স্বপ্নাবস্থায় মন বিনা বাধায় ক্রিয়া করে। জাগ্রদবস্থা এবং স্বপ্নাবস্থার মধ্যে পার্থক্য হল, জাগ্রদাবস্থায় মন বহির্বিষয়ে অনুভূতিসম্পন্ন, স্বপ্নাবস্থায় মন শুধু বাসনা বা সংস্কার ভোগ করে। সুষুপ্তিও মানব জীবনের একটি স্বাভাবিক অবস্থা। এই অবস্থায় মন এবং ইন্দ্রিয় উভয়ই সক্রিয়। এই অবস্থায়, যে ব্যবহারিক চেতনা বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে প্রভেদ করে, তার বিরাম ঘটে। বলা হয়ে থাকে যে এই অবস্থায় আমাদের বিষয়শূন্য চেতনা থাকে যখন আত্মা ব্রহ্মের সঙ্গে ক্ষনিক মিলন লাভে সমর্থ হয়। তবে সুষুপ্তি চেতনার অস্তিত্বহীনতার অবস্থা নয়। অবশ্য এটা ধারণা করা কঠিন যে সুষুপ্তিতে আত্মার অস্তিত্ব থাকে, এবং যদিও তার কোন অভিজ্ঞতা হয় না তবু আনন্দ ভোগ করে। বস্তুতঃ উপনিষদ শারীরিক এবং অচেতন ক্রিয়াগুলিকে প্রাণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করে। প্রাণই শ্বাস প্রশ্বাস, রক্তচলাচল প্রভৃতি ক্রিয়াগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে। সুষুপ্তিতে আত্মার আনন্দ উপভোগের বিষয়টি বিতর্কমূলক বিষয়। তুরীয় অবস্থায় সকল কিছুর ঐক্যের অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি হয়।

মন চেতনার থেকে ব্যাপক

প্রাণের সাহায্যে অচেতন ক্রিয়াগুলির ব্যাখ্যা

1. ছান্দোগ্য, ৩।১৪।৩ 2. শ্বেতা, ৩।১৩ 3. মাণ্ডুক্য, ৩

১৯। উপসংহার (Conclusion) :

উপনিষদকে সব ভারতীয় দর্শনের উৎসরূপে গণ্য করা হয়। [1]ব্লুমফিল্ড মন্তব্য করেন, "নাস্তিক বৌদ্ধদার্শনিককে নিয়ে এমন কোন প্রধান হিন্দুদর্শন নেই যার মূল উপনিষদে নেই।" ডঃ রাধাকৃষ্ণন বলেন, 'উপনিষদ-পরবর্তী দার্শনিক চিন্তাধারার মধ্যে উপনিষদের মতামতের সঙ্গে সংগতি বিধানের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়'। উপনিষদের পরে আমরা পাই ভগবদগীতা। ভগবদগীতাকে উপনিষদ গ্রন্থাবলীর সারমাত্র মনে করা হয়। একটা প্রসিদ্ধ শ্লোক আছে—বহু উপনিষদরূপ গাভীর দুগ্ধ দোহন করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার সারাংশ দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতারূপ ক্ষীর প্রস্তুত করে হিন্দুর ভোজন সামগ্রী প্রস্তুত করেছেন। এখনও পর্য্যন্ত যখন জগতে দর্শন, ধর্ম ও বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধনের প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন একমাত্র উপনিষদই মানুষকে পথ দেখাতে পারে। কোন পণ্ডিত ব্যক্তি এরূপ মন্তব্য করেছেন যে ভারতে ধর্মসংস্কার সম্পর্কীয় সকল প্রকার আন্দোলন উপনিষদ থেকেই তাদের প্রেরণা লাভ করেছে। বেদান্তের বিভিন্ন আচার্য্য শঙ্কর, রামানুজ, নিম্বার্ক, মাধব এবং বল্লভ উপনিষদকে পুণ্য গ্রন্থরূপে জ্ঞান করেছেন এবং নিজ নিজ মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য উপনিষদের ব্যাখ্যা করেছেন। অন্যান্য দর্শন কিভাবে উপনিষদের দ্বারা প্রভাবিত আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। রাজা রামমোহন রায়, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ সমাজ সংস্কারকগণ উপনিষদের দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। মিড (*Mead*) উপনিষদকে 'বিশ্বশাস্ত্র' (world scriptures) বলে অভিহিত করেছেন। এছাড়াও বিশ্বের অনেক সুধী ব্যক্তি, সোপেনহাওয়ার, গান্ধী, অরবিন্দ উপনিষদের ভাবধারার দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত।

[2]রাধাকৃষ্ণন উপনিষদের একটি ত্রুটির কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন যে উপনিষদে আত্মা ও ব্রহ্মের অভিন্নতার কথা বলা হয়েছে। তবে এই সংহতির দুর্বলতা হল যে, এই সংহতি যতটা না স্বজ্ঞা বা অপরোক্ষানুভূতির মাধ্যমে

---

1. *Bloomfield* : The Religion of the Vedas.

2. Radhakrisnan : Indian Philosophy vol. I. page 264.

প্রাপ্ত, সুস্পষ্ট বিচারবুদ্ধির দ্বারা ততখানি নয়। যদিও সব যথার্থ দর্শনের মূল ধারণার উপর এই দার্শনিক সংহতির প্রভাব রয়েছে, তবু বিভিন্ন উপাদান যেগুলিকে এই সংহতি একত্রিত করেছে, সেগুলির কোন যৌক্তিক সমন্বয় উপনিষদ দেয় না।

Questions

1. Trace the development of the monistic and monotheistic ideas in the Vedas and the Upanisads.
[C. U. Hons. 1973

2. "In solving the questions of the nature of ultimate-reality the Upanisad thinkers seek to supplement the objective vision of the vedic seers by a subjective one."—Discuss.

3. Expound the nature of the ultimate Reality according to the Upanisads.

4. Trace the development of thought from the Vedas to the Upanisads.

5. Expound the Upanisadic conception of the world.

6. Explain the Upanisadic conception of Brahman and its relation to the world.

7. How does Upanisad distinguish between :
(i) Vidyā and Avidyā. (ii) Sreyah and Preyah.

8. Expound the ethics of the Upanisads.

9. Elucidate the Cosmic (Saprapanca) and acosmic (Nisprapanca) conceptions of the Absolute (Bramhan) in Upanisadic Philosophy. [B. U. H. 1968

10. Elucidate the conception of bondage and liberation as you find it in the Upanisads.

উপনিষদের দর্শন রচনায় নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির সাহায্য নেওয়া হয়েছে :

1. *S. Radhakrishnan* : Indian Philcsophy. Vol-I
2. *Dr. J. N. Sinha* : History of Indian Philosophy. Vol-I.
3. *M. Hiriyana* : Outlines of Indian Philosophy.
4. অতুলচন্দ্র সেন : উপনিষদ
5. *C Sharma* : A Critical Survey of Indian Philosophy.
6. *R. N. Sharma* : Indian Philosophy.
7. শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় : উপনিষদের দর্শন।
8. *R. D Ranade* : A Constructive Survey of Upanisadic Philosophy.
9. *Max-Muller* : The Upanisads.
10. *Deussen* : The Philosophy of the Upanisads.
11. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস : প্রথম খণ্ড : দ্বিতীয় ভাগ (ভারত সরকারের শিক্ষাধিকারিক বিভাগের উদ্যোগে লিখিত ও প্রকাশিত)।
12. উপনিষৎ গ্রন্থাবলী : স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ ও তৃতীয় ভাগ।